শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

মূল্য এক টাকা চারি আনা

উপহার

স্নেহের জয় ও বিজয়,

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদের নিদর্শনরূপে বইখানা তুলে দিচ্ছি তোমাদের হাতে যে উদ্দেশ্যে ; আশা করি, তা' বোঝবার মত হৃদয় তোমাদের আছে। ইতি—

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী—১৩৫৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
গৌরগোপাল

প্রকাশকের নিবেদন

বইখানি ধারাবাহিকভাবে 'শিশু-সাথীতে' প্রকাশিত হবার সময়ই বহু পাঠক-পাঠিকার সস্নেহ অভিনন্দন লাভ ক'রেছে। আমরাও তাই একে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে প্রকাশ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছি। এক্ষণে বইখানি কিশোর-মহলে যোগ্য সমাদর লাভ করলেই আমাদের চেষ্টা সফল হয়েছে ব'লে মনে ক'রবো। ইতি—

বিনীত—

প্রকাশক

সাফল্যের আনন্দে সঞ্জয়ের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! ওঃ, কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে আজ কৃতকার্য্য হয়েছে সে।···ভাবতে গেলেও যেন সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! একদিকে বিপুল বেদনা, অন্যদিকে বিজয়ীর আনন্দ একসঙ্গে তাকে অভিভূত ক'রে তোলে!

মানসপটে ভেসে ওঠে—বায়োস্কোপের ছবির মত—বিগত কয়েক বছরের একটির পর একটি ঘটনা!

অদৃষ্ট তাকে পরিহাস করেছে—বার বার তাকে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছে নির্ম্মমভাবে, কিন্তু সে অটল অচলের

ন্যায় স্থির হয়ে দুর্ব্বার মনোবলে—অদম্য উদ্যমে এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যের দিকে !

আজ পুরুষকার তাকে বিজয়মাল্যে মণ্ডিত করেছে। আজ তার আশা হয়, মানুষ হয়ে হয়ত এবার সে দাঁড়াতে পারবে বিশ্বের বুকে। পূর্ণ ক'রে তুলতে পারবে তার জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—সাধনার পথে নিয়ে আসতে পারবে পরিপূর্ণ সিদ্ধি !

একাগ্র সাধনা যে মানুষের ললাটে সাফল্যের জয়টীকা পরিয়ে দিতে পারে, সে তার প্রমাণ পেয়েছে তারই জীবনে। সুতরাং আজ তার বুকে এসেছে আত্মবিশ্বাস, মনে জেগেছে অদম্য শক্তি।

যদিও আজ পর্য্যন্ত সে জীবনে যেটুকু সম্ভব করতে পেরেছে, তার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নেই, এবং অন্যের কাছেও হয় তো তা নিয়ে গৌরব বোধ করা চলে না ; কিন্তু যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সে গিয়েছিল প'ড়ে, তাতে তো তার পক্ষে জগতে টিকে থাকাই ছিল একান্ত অসম্ভব।

সুতরাং সেই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে সে যে আজ একটা পরিচয়ের সোপানে এসে দাঁড়িয়েছে,—এইটুকুই তো তার কৃতিত্বের দিক দিয়ে যথেষ্ট ব'লে মেনে নিতে হবে।

আজকার সাফল্যের আনন্দের জন্যে—তাকে যে মূল্য দিতে হয়েছে, তার গুরুত্ব যে কত বেশী, তা সহজেই

অনুমান করতে পারা যায়, তার বিগত জীবনের প্রায় বারোটি বছরের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলেই, এবং তার মধ্যে খুঁজলেই দেখতে পাওয়া যাবে,—কেমন ক'রে তার মানসক্ষেত্রে উপ্ত হয়ে উঠেছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের প্রাণপূর্ণ সতেজ বীজ !......

'ক্লাস সেভেন'-এ সে যখন পড়ে তখন প্রায় একসঙ্গেই মারা পড়ে তার পিতা এবং মাতা।

অবস্থা তাদের ভাল ছিল না। কাজেই অর্থাভাবে তার বাপ-মায়ের চিকিৎসাও হয় নি, আর ঔষধ-পথ্যও জোটে নি। মাতা-পিতার শোচনীয় সেই মৃত্যু সঞ্জয় দেখেছে দুই চোখ ভ'রে —দুঃখে বেদনায় সে হয়ে উঠেছে জর্জ্জরিত; কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ই সে করতে পারে নি। শুধু দেখেছে—নিরুপায় অক্ষমের মত শুধু অশ্রুভরা চোখে দেখেছে,—দরিদ্র যারা, তারা এই জগতে কেমন ক'রে—কত শোচনীয় ভাবে—বিনা চিকিৎসায় —বিনা ঔষধ এবং পথ্যে মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়!

বয়স তার তখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর। ওইটুকু বয়সে কিই বা উপায় করতে পারে সে! দিশেহারা হয়ে ছুটেছে সে একে একে তল্লাটের যত ডাক্তার-কবিরাজের কাছে। কিন্তু কোথাও কারো কাছে পায় নি এতটুকু সহানুভূতি। সব্বাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ঘৃণায় আর উপেক্ষায়।

কেউ কেউ বা যথেষ্ট অপমানিত করেছে তাকে। বলেছে— "এটা কি দানছত্র নাকি হে?...বিনা পয়সায় চিকিৎসা?

আবদার তো মন্দ নয়! বলে—পয়সা নিয়েই চিকিৎসা করবার সময় হয় না, তা আবার বিনা পয়সায়? যাও, যাও, দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাও। আমরা ব্যবসা করতে বসেছি,—দান করতে বসি নি।"

দাতব্য চিকিৎসালয় অবশ্য তল্লাটে একটিও ছিল না। সুতরাং সঞ্জয়ের ওপর সেরকম উপদেশ দেওয়া হয়েছিল একান্ত নিরর্থকই!

মাতা-পিতার বিচ্ছেদ-ভাবনায় কাতর সঞ্জয় আবার যদি ঘুরে কিছু বলতে গেছে, তো তার ভাগ্যে জুটেছে 'অর্দ্ধচন্দ্র' অর্থাৎ গলাধাক্কা!

চোখের জল মুছতে মুছতে সে তবু ছুটেছে অন্যজনের কাছে। তার পায়ে ধ'রে সেধেছে তার বাপ-মাকে একটিবার দেখে আসবার জন্যে; অন্ততঃ একশিশি ওষুধ দেবার জন্যেও।

চিকিৎসকবর বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে পরম অভিজ্ঞের মত উত্তর দিয়েছেন—"খেতে পরতে যাদের জোটে না—তাদের তো মরাই ভাল হে! তাদের মরতে দাও,—ম'রে তারা বাঁচুক। সংসারে এসে যারা খেতে পরতে পায় না,—বেঁচে মরেই থাকে, তাদের মরণে বাধা দিতে যাওয়ার তো কোন অর্থই হয় না! কেননা মরেই তারা বেঁচে যায়,—খালাস পায় দুঃখ-জ্বালার হাত থেকে। যাও,

যাও বাপু, আমার অনেক কাজ· এখানে আর ঘেনর ঘেনর ক'রো না।”

উপদেশগুলো সঞ্জয়ের বুকে তীরের মতই বিঁধেছে,—বুকের মধ্যে তার গুম্‌রে উঠেছে অনেক কথাই, কিন্তু কণ্ঠে তার ফোটে নি একটিও !...

নিরুপায়ের একমাত্র সম্বল চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে নিরাশ হৃদয়ে ফিরে এসেছে ঘরে ! কেঁদেছে অঝোর-ঝোরে ! ভগবানকে ডেকেছে অজস্রবার ! কিন্তু ফল হয়নি কিছু !

বধির ভগবান।...তা না হ'লে এই বিশাল দুনিয়ায় সঞ্জয়ের মত কত বিপন্ন দরিদ্র জীর্ণকণ্ঠে ডাকছে তাঁকে মুহুর্মুহু : তাঁর আসন কি একবারও টলতো না ?...

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সঞ্জয় চারদিকে চেয়ে দেখলো,—সব শূন্য, সব অন্ধকার ! মাথার ওপরের অনন্ত আকাশও যেন তার দিকে চেয়ে অট্টহাস্য করছে !

বিনা চিকিৎসায়, ঔষধ এবং পথ্যের অভাবে যাদের মর্ম্মান্তিক ভাবেই ঢ'লে পড়তে হয়েছে মৃত্যুর কোলে, তারা যে পুত্রের জন্য কিছু রেখে যেতে পারেন নি একথা বলাই তো বাহুল্য।

থাকবার মধ্যে ছিল, কাঠা দশেক জায়গার ওপর—সংস্কার অভাবে জীর্ণ এক বাস্তু, আর তার মধ্যে অতি

অকিঞ্চিৎকর কয়েকটা জিনিষপত্র। সুতরাং সেদিকে চেয়ে সঞ্জয়ের আশান্বিত হবার ছিল না কিছুই।

তবে জায়গাটার ওঁপর ছিল তার একটা দুর্দ্দমনীয় মায়া,—জন্মস্থান বা পৈতৃক ভূমির ওপর সেটা থাকা প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবন-ধারণের সমস্যা যেখানে গুরুতর, সেখানে কেবল ভিটের মায়া মানুষকে কোন দিনই বেঁধে রাখতে পারে না।

তবে এর মধ্যে আর একটি জিনিষ ছিল। তা হচ্ছে পড়াশোনার ওপর সঞ্জয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ।

গ্রাম থেকে মাইল দুই দূরে—সোনাডাঙ্গা হাই স্কুলে সে পড়তো। মাতা-পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে যায়,—এমন কথা ভাবতেও তার অন্তরে কেমন একটা ব্যথা জেগে উঠতো।

সে যখন স্বতন্ত্র একটা মানুষ—তাকে যখন এ জগতে বেঁচে থাকতে হবে, পাঁচজনের মাঝে একজন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—তার সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, গৌরব-কলঙ্ক প্রভৃতি সব কিছুরই দায়ী যখন সে নিজেই—এমন কি তার পিতৃবংশের মান-মর্য্যাদা, স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব যখন তারই ওপর করেছে নির্ভর, তখন বাপ-মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার তো কিছুই চ'লে যায় নি—বরঞ্চ তার ওপর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে! সুতরাং তাকে যেমন ক'রে হোক মানুষ হয়ে

উঠতে হবে। আর তা হতে হলে শিক্ষালাভ যে অপরিহার্য্য এ আর কে না স্বীকার করবে?

সুতরাং অনেক ভেবে চিন্তে সে স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে আবেদন করলে---যেন তাকে স্কুল-বোর্ডি-এ ছুটি ক'রে খেতে দেওয়া হয়, আর স্কুলে তার ফ্রী-ষ্টুডেন্ট-সিপ মঞ্জুর করা হয়।

দরখাস্ত পেয়ে সেক্রেটারী তাকে ডেকে পাঠালেন। আশান্বিত হয়ে সঞ্জয় সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট গিয়ে যথারীতি অভিবাদন ক'রে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো।

মন তখন তার আশা-নিরাশার দোলনায় দোল খাচ্ছে। সেক্রেটারী মহাশয়ের উত্তরের প্রতীক্ষায় সে তাঁর দিকে চেয়ে আছে সতৃষ্ণনয়নে।

সেক্রেটারী মহাশয় স্কুলের খাতাপত্র দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে সঞ্জয়ের দিকে চাইলেন,—"কোত্থেকে আসছো তুমি?—" ভ্রুকুটি ক'রে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি নাম তোমার?"

সঞ্জয় বিনীত ও কাতরভাবে তার পরিচয় জ্ঞাপন করলো।

"হু"—ব'লে সেক্রেটারী মহাশয় আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন। সঞ্জয়ও নীরব। দেওয়ালের ঘড়িটা টক্-টক্ ক'রে

কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগলো। সঞ্জয়েরও বুক তখন করছে ঢুই—ঢুই—ঢুই!

চশমাটা চোখ থেকে খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে সেক্রেটারী মহাশয় বললেন—"তোমার এর আগের তিন মাসের মাইনে বাকী আছে না?" তাঁর স্বরে কিছু গম্ভীরতা ফুটে উঠলো।

"আছে স্যার"—নম্রকণ্ঠে সঞ্জয় জবাব দিলে—"মৃত্যুর চার মাস আগে বাবার চাকরী গিয়েছিলো; দারুণ অর্থাভাবে পড়েই—"

সহসা তাকে বাধা দিয়ে সেক্রেটারী ব'লে উঠলেন—"বাকী মাইনেটা না হয় আমি মকুব ক'রে দিতে পারি। কিন্তু ফ্রী-ষ্টুডেণ্ট-সিপ মঞ্জুর করতে পারি না। কারণ আমাদের স্কুলের নিয়ম হচ্ছে,—বিশেষ 'মেরিট' যার আছে, এমন ছেলেই 'ফ্রী' পেতে পারবে। কিন্তু উপর্য্যুপরি দু'বছরের—ছয়টি পরীক্ষায় যা দেখছি, তাতে তুমি কোনরকমে পাশ করেছ মাত্র। তোমার মত ছেলেকে ফ্রী-ষ্টুডেণ্ট-সিপ মঞ্জুর করবার নিয়ম-কানুন তো নেই।...আমি কি করতে পারি বল?"

ব্যর্থতার আশঙ্কায় সঞ্জয়ের বুক কেঁপে উঠলো। তার দুই চোখ জলে ভ'রে এলো। আকুল মিনতির স্বরে সে বললে—"অভাব-অভিযোগে ভাল ক'রে পড়াশোনা করতে

পারি নি স্যার! কিন্তু সে যাহোক, মাতাপিতৃহীন নিঃসহায়-নিঃসম্বল ছাত্রের ওপর কি আপনি একটু দয়া-মায়া বা সহানুভূতি করবেন না?”

“ব্যক্তিগত দয়া-মায়া বা সহানুভূতির কথা এখানে উঠতেই পারে না।” সেক্রেটারী গম্ভীরভাবেই জবাব দিলেন—“স্কুল কমিটি যেসব নিয়ম-কানুন করেছেন, তাই মেনে চলতে হবে আমাকে। ফ্রী-ষ্টুডেন্ট-সিপ মঞ্জুর করতে কোন মতেই পারবো না আমি।”

আর বোর্ডিংএ ‘ফ্রী’ হবার জন্যে হেডমাষ্টার মশায় এবং বোর্ডিং-সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বল, ওতে আমার কোন হাত নেই।”

এরকম সাফ জবাব পেয়েও সঞ্জয় অনেক কাকুতি-মিনতি করলে। কিন্তু সেক্রেটারী মহাশয় নিয়ম-কানুনের এতটুকু বাইরে যেতে সম্মত হলেন না।

অগত্যা সেখান থেকে ফিরে সঞ্জয় হেডমাষ্টার এবং বোর্ডিং-সুপারের সঙ্গে দেখা ক’রে তার আবেদন জানালে।

কিন্তু হায়, একটা কথা আছে—অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়! সুতরাং সেদিকেও কোন ফল ফললো না। নৈরাশ্যের গুরু বোঝা বুকে ক’রে সঞ্জয়কে ফিরে আসতে হ’ল নিতান্ত ব্যথাহতভাবেই।

সহানুভূতি পাবার যথার্থই পাত্র ছিল সে। কিন্তু মানুষের গড়া নিয়ম-কানুন—মানুষের অন্তরের উচ্চ প্রবৃত্তির কণ্ঠ চেপে

ধরলো এবং এই ব্যর্থতার ব্যথায় সঞ্জয়ের কাছে জগৎটা মনে হতে লাগলো আরও শূন্য—আরও অন্ধকার!...এখানে যেন সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলাও মানুষের পক্ষে কষ্টকর!

দারুণ ক্ষোভে একবার সঞ্জয়ের মনে হলো, এ গ্রামের সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না। এখানে থাকা তার পক্ষে যখন একেবারেই অসম্ভব এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্যে যখন তাকে চ'লে যেতেই হবে অন্য জায়গায়, তখন ঐ বাস্তুভিটেটুকু এখানে রেখেই বা আর কি দরকার?

সে ওটা কাউকে বেচে দিয়ে চ'লে যাবে—অদৃষ্ট তাকে যেখানে—যেদিকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু ঐ সামান্য পিতৃ-ভূমিটুকুর কি যে আকর্ষণ—কি অচ্ছেদ্য মায়ার বাঁধনে ঐ ভগ্নকুটীর যে বেঁধে রেখেছিল তাকে—সে কোন মতেই তার কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে পারলো না। ঐ ভিটেটুকুর সঙ্গে নিজের হাতে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে তার প্রাণের মাঝে যেন তীব্র একটা ব্যথার কাঁটা খচ-খচ ক'রে উঠতে লাগলো!

অবশেষে একদিন সে সব ফেলে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো,—তার ভবিষ্যতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। মানুষ যদি হ'তে পারে—আবার ফিরে আসবে গ্রামে। কিন্তু কোথায় যাবে সে?...গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশনে এসে সে ভাবলো কিছুক্ষণ।

অবিলম্বেই সে স্থির ক'রে ফেললে তার গন্তব্য স্থান। কাটলে হাওড়ার টিকিট; তারপর সারারাত্রি ট্রেনজার্ণি ক'রে পরদিন সকাল সাতটায় পৌঁছলো এসে বাংলার রাজধানী কলকাতায়।

কলকাতায় সে প্রথম দু'-তিন দিন লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো; একদিন তো দোতালা বাসের তলায় প'ড়ে তার মরবারই কথা!—সে বেঁচে গেলো নিতান্ত পরমায়ুর জোরে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন তার দেখা হলো তার মামার রাড়ীর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে।

কথায় কথায় সঞ্জয় তাকে বললে তার সম্বন্ধে যাবতীয় কথাই; একটুও গোপন করলে না।

ভদ্রলোক কবি। মনটা ছিল তাঁর কোমল; সঞ্জয়ের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা শুনে তাঁর অন্তর সত্যিই বেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠলো।—কিন্তু বাংলাদেশের কবি তিনি। তাঁর অবস্থাও তথৈবচ! সঞ্জয়ের তেমন কিছু একটা উপকার করেন, এমন ক্ষমতা তাঁর কোথায়? কিন্তু মনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন উদার; কাজেই তাঁর সঙ্গে যা দু'-এক টাকা ছিল, তা তিনি তৎক্ষণাৎ সঞ্জয়কে দান করলেন। উপরন্তু তাঁর ঠিকানা দিয়ে দু'-তিন দিন পরে সঞ্জয়কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন বারবার ক'রে।

ঝাঁটাগাছটা নিজে অপরিচ্ছন্ন হ'লেও যে জায়গাটার উপর দিয়ে যায়,—সেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে তোলে।

দরিদ্র কবির নিজের সাহায্য করবার ক্ষমতা না থাকলেও তাঁহার দ্বারা সঞ্জয়ের উপকার হলো যথেষ্ট। তিনি ব'লে কয়ে একটা বইয়ের দোকানে সঞ্জয়ের একটা চাকরী ক'রে দিলেন।

বেতন অবশ্য সামান্যই।—কিন্তু তা'হোক, একটা অবলম্বন তো কিছু হলো! এরপর কয়েকটি সংবাদপত্রের ম্যানেজারদের সঙ্গেও কবি সঞ্জয়ের পরিচয় ক'রে দিলেন। সেদিক দিয়েও সঞ্জয়ের কম উপকার হলো না। সে অবসর সময়ে দু'দশখানা ক'রে খবরের কাগজ এনে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করতে লাগলো। কবির পরিচয়ে এবং সঞ্জয়কে দেখে বিশ্বাসী ও সৎ ব'লে মনে হতো; পত্রিকার ম্যানেজারবাবুরা তাকে আগে কাগজ দিয়ে পরে পয়সা নিতে লাগলেন।

বইয়ের দোকানের মাইনে আর খবরের কাগজ বিক্রীর কমিশন—এই দুয়ে মিলে সঞ্জয় যা পেতে লাগলো, তাতে তার চ'লে যেতে লাগলো কোন রকমে।

কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল অন্যদিকে এবং লক্ষ্যবস্তুও ছিল উচ্চ। সে নানা রকম কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে—ক্লাস এইটের বইগুলো কিনে রাত্রে যেখানে একটু আলোর সুবিধা পায়, সেইখানে ব'সেই পড়তে সুরু ক'রে দিলে।

এমনি ক'রে পরবৎসর সে কিনলে ম্যাট্রিকের যাবতীয় বই—তারপর দারুণ অধ্যবসায় এবং কঠোর

পরিশ্রমে নিজেকে তৈরী ক'রে নিয়ে, সে প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে।

যথাসময়ে পরীক্ষার খবর বার হতে দেখা গেল,- সঞ্জয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সেদিন তার বাপ-মাকে বড় ঘন ঘনই মনে পড়েছিলো,—হায়, তাঁরা আজ বেঁচে থাকলে, না জানি কত আনন্দই না লাভ করতেন। আর মনে পড়েছিলো তার সোনাডাঙ্গা হাইস্কুলের সেক্রেটারী এবং হেড্‌মাষ্টারের কথা—যাঁদের কাছ থেকে নৈরাশ্যের বোঝা বুকে নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফিরে আসতে হয়েছিলো তাকে।

তবে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে সে যে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে,—এর জন্যে সেদিন সে আনন্দও লাভ করেছিলো প্রচুর। সে আনন্দের তুলনা বুঝি আর মেলে না।

কবিকেও সে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিলো সহস্রবার। কৃতজ্ঞতার ভাষা অবশ্য তার কণ্ঠে যোগায় নি, কিন্তু তার ছলছলে চোখ দুটি যেন জ্বলন্তভাষায় তার প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিলো। কবিও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে উৎসাহিত করেছিলেন, আরো এগিয়ে যেতে।

চলার পথে মানুষ যত এগিয়ে যেতে পারে, এগিয়ে যাবার নেশা বা উৎসাহও তার তত বেড়ে যায়। সুমুখ পানে এগিয়ে

চলার শক্তি যেন তখন তার বুকে জেগে ওঠে; বাধা-বিঘ্নগুলো তখন মনে হয়,—পায়ের নীচের ঘাসের মত।

এগিয়ে চলার কল্পনায় সঞ্জয়ও উঠলো মেতে। কবির উৎসাহ-বাণী এই সময় তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে লাগলো। যাঁদের বাণীতে দেশ জাগে, জাতি জাগে, সমগ্র বিশ্ব ঘুম থেকে জেগে উঠে—হোক দরিদ্র তবু আমাদের এই সাধারণ কবিটিও ছিলেন তাঁদেরই জাত! সুতরাং তাঁর উৎসাহ-বাণীতে সঞ্জয়ের মত একটি মানুষের প্রাণও যে জেগে উঠবে, সে আর বিচিত্র কি?...

উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ক্রমশঃই সঞ্জয়ের প্রাণ অধীর হয়ে উঠতে লাগলো, কিন্তু অনেক সময় এমনই বিড়ম্বনা হয় যে, আশা এবং আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ চলার পথ যেন আর মেলে না। প্রাণ হয়ে উঠেছে চলবার জন্যে অধীর আগ্রহে চঞ্চল,—অথচ সম্মুখে-দক্ষিণে বামে কোন দিকেই যেন পথের সন্ধান মিলছে না! সঞ্জয়েরও হলো তাই।

এমন সময় একদিন এক ভদ্রলোক দোকানে এসে চাইলেন,—খান দুই-তিন ভ্রমণ-কাহিনী এবং দুই-তিনখানা শিকার-সম্বন্ধীয় বই।

তখন দুপুর বেলা। দোকানে অন্য কোন খরিদদার বা গ্রাহক ছিলো না; আর দোকানেও ছিলো না—সঞ্জয় ছাড়া অন্য কোন কর্ম্মচারী বা দোকানের মালিক। তারা ছিলো কার্য্যান্তরে লিপ্ত।

দোকানের দেখাশোনা করছিলো সঞ্জয়। ভদ্রলোকের বরাতমত সঞ্জয় খানকয়েক বই বের ক'রে তাঁকে দেখতে দিলে।

বইগুলো উল্‌টে পাল্‌টে দেখতে দেখতে সঞ্জয়ের সঙ্গে হলো তাঁর পরিচয়। সঞ্জয়ের জীবনের ইতিহাস শুনতে শুনতে তিনি আশ্চর্য্যও হলেন যেমন,—সঞ্জয়ের প্রতি আকৃষ্টও হলেন ঠিক তেমনি।

ভদ্রলোক বয়সে যুবক।—অগাধ ধনী। সংসারে বন্ধন তাঁর তেমন কিছুই নেই, তবে ভ্রমণের এবং শিকারের ওপর তাঁর এক দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ আছে। সঞ্জয়ের পরিচয় পেয়ে তিনি বই দেখা বন্ধ রেখে তার সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন।

ভারী সন্তুষ্ট হলেন তিনি সঞ্জয়ের সপ্রতিভ সরল মধুর শিষ্ট আচরণে এবং তার কথাবার্ত্তায়। সঞ্জয়ের সহনশীলতা, ধৈর্য্য, সৎসাহস, দৃঢ়চিত্ততা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ভদ্রলোক যত ভাবতে লাগলেন, ততই যেন সঞ্জয় তাঁর কাছে লোভনীয় এবং কাম্য হয়ে উঠতে লাগলো।

অবশেষে তিনি মত প্রকাশ করলেন,—তাঁর একজন তরুণবয়স্ক ভ্রমণ-সঙ্গীর একান্ত আবশ্যক। সঞ্জয়ের যদি মত থাকে, তবে তিনি তাকে তাঁর নিত্য সহচররূপে নিযুক্ত করতে পারেন। সঞ্জয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের যাবতীয় ব্যয়ই বহন করবেন তিনি। উপরন্তু সঞ্জয় বেতনস্বরূপ মাসে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা

ক'রে পাবে। তা ছাড়া সঞ্জয়ের প্রতি তাঁর ব্যবহার হবে—ঠিক বন্ধুর মত—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত! তবে সঙ্গী হয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গল প্রভৃতি দুর্গম জায়গায়। অবশ্য নিজের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখবেন যেমন, সঞ্জয়ের সুবিধা-অসুবিধার প্রতিও রাখবেন ঠিক তেমনই এবং ভ্রমণ-পথের অসুবিধাগুলো যথাসম্ভব দূর করবার জন্যে তিনি কোনরূপ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবেন না কোন দিনই।

ভদ্রলোকের প্রস্তাব শুনে সঞ্জয়ের উন্নতির প্রতি আগ্রহশীল মন আনন্দে নেচে উঠলো। ভ্রমণ যে মানুষের মনের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আনয়ন করে,—মানুষের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে দেয়—ভ্রমণের ফলে নানা বিষয়-বস্তু, স্থান ইত্যাদি দেখেশুনে মানুষ যে সাধারণের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অসাধারণত্বের সাধনায় অগ্রসর হবার মত শক্তি লাভ করে, এসব কথা সঞ্জয় অনেক বইয়ে পড়েছিল, অনেক ভূ-পর্য্যটকের আত্মজীবনী হ'তেও জেনেছিল।

তা ছাড়া, সহরের এই এক-ঘেয়েমির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, সে যে মুক্ত প্রাণে মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারবে, পর্য্যটনের ফলে তার দেহ-মনে যে একটা নূতন পরিবর্ত্তন আসবে, এবং উত্তরোত্তর সে যে আরো সাহসী, দৃঢ়চিত্ত, সহনশীল, কর্ম্মক্ষম এবং দুঃখজয়ী হয়ে উঠতে পারবে,

এই কল্পনার পুলক-প্রবাহ যেন তার প্রতি শিরা-উপশিরায় বয়ে যেতে লাগলো।

সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে জবাব দিলে—"আপনি যদি আমাকে আপনার সঙ্গী হিসাবে পছন্দ করেন, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত আছি।"

"ভাল কথা।"—ভদ্রলোক বললেন—"তা'হলে আপনি দু'-তিন দিনের মধ্যে এই ঠিকানায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তা'হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"—ব'লেই তিনি পকেট থেকে একখানা কার্ড বের ক'রে সঞ্জয়ের হাতে দিলেন। তারপর আবার বললেন—"আপনি আমার ওপর আস্থা রেখে কাজ করবেন; ভাববেন না যে, আমি আপনাকে একটা নিশ্চিত কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আপনার এ-কূল, ও-কূল—দুই কূলই নষ্ট ক'রে দেব। আপনি নির্ভাবনায়—যদি ভাল বোঝেন, এ কাজ ছেড়ে আমার কথামত কাজ করতে পারেন।"

তাড়াতাড়ি ক'রে সঞ্জয় বললে—"না না, তা আমি ভাবছি না। আপনার মত লোকের কথায় কি আমার অনাস্থা থাকতে পারে? তা'ছাড়া, আমার অনিষ্ট ক'রে আপনার লাভই বা কি?...যা হোক, আমি দু'তিন দিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে সব ঠিক ক'রে আসব।"

"বেশ, বেশ!"—ভদ্রলোক সানন্দেই ব'লে উঠলেন—

"আপনি যাবেন সকালের দিকে আমার কাছে। বাকী কথা সেইখানেই বলব।"

ব'লেই তিনি তিন-চারখানা বই পছন্দ ক'রে তার দাম দিয়ে আর একবার সঞ্জয়কে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে দোকান ত্যাগ করলেন।

সঞ্জয় ব'সে ব'সে কিছুক্ষণ ধ'রে তার কথাই ভাবতে লাগলো। কার্ডে সে দেখলে লেখা আছে—অবশ্য ইংরাজিতে—

"পীযূষকান্তি গুপ্ত, এম. এ.

...নং ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।"

ঠিক এমনি সময় কোথা হ'তে কবিও এসে হাজির। সঞ্জয়ের মুখে সমস্ত কথা শুনে কবি আনন্দের আতিশয্যে যেন লাফিয়ে উঠলেন এবং উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন—"এক্ষুনি, এক্ষুনি ভায়া, এই দণ্ডেই লেগে পড়ো। জীবনে নানানতর নূতনত্বের স্বাদ পাবে,—প্রাণে জেগে উঠবে সোনার কাঠির স্পর্শে; চোখে আসবে নতুন আলোক, চিত্তে জাগবে নব উন্মাদনা। জীবনটাকে গ'ড়ে তোলবার এমন চমৎকার সুযোগ ছেড়ো না ভায়া!...আর ঐ ভদ্রলোককে তো আমি ভাল ক'রেই চিনি। দিলদার পুরুষ...বে থা কিছু করেন নি; পড়ে শুনে, নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়ে আর সাধারণের পাঁচ কাজে লেগেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। অর্থের অভাব নেই, খরচেরও অন্ত নেই।...ভাগ্যবশে জুটে গেছে ভাল!"

পরে একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন—"ভাবনা কি ভায়া, গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে ছুটে যাও সীমাহীন কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে। জীবন তোমার সার্থক হয়ে উঠবে। কবি গেয়েছেন—

ভয়-ভাবনা করিস কেন ?
চলরে ছুটে সুমুখ-পানে ;
ভাসিয়ে দিয়ে বিঘ্ন-বাধা
কর্ম্ম-গাঙের জোয়ার-টানে।
খাঁচার মাঝে বদ্ধ হয়ে
থাকবি কেন প্রাণের ভয়ে ;
মুক্তালোকে চল ছুটে চল
বীরের মত অটল প্রাণে ;
অসীম তোরে ডাক দিয়েছে,
প্রাণ ভরে নে তাহার দানে।"

সরলভাবে কবি ভাবের আবেগে কবির স্বভাব-ধর্ম্ম অনুযায়ী ফেনিয়ে ফেনিয়ে ব'লে গেলেন।

প্রাণখোলা কবির ভাবোচ্ছ্বাসে সঞ্জয়ের প্রাণও পুলক-প্রবাহে নেচে উঠলো। হাসতে হাসতে সে বললে—"অধমের ওপর কবির দয়ার তো অন্ত নেই। আমার বহু ভাগ্য যে, কবির করুণার দৃষ্টিতে পড়েছিলাম। কবির আশীর্ব্বাণী মাথায়

নিয়ে যখন জীবনের কর্ম্মপথে এগিয়েছি, তখন সফলতা একদিন আসবেই জীবনে।"

"নিশ্চয় আসবে।"—দৃঢ়কণ্ঠে কবি আবার ব'লে উঠলেন—"তুমি শুধু নির্ভাবনায় এগিয়ে চলো।"

পূর্ণ তিনটি বছর ধ'রে পীযূষকান্তির ভ্রমণসঙ্গী রূপে সঞ্জয় ঘুরে বেড়ালো কত পাহাড়-পর্ব্বতে, বনে-জঙ্গলে, নদ-নদী-সাগরের বুকে ; দেখলো কত দেশ, কত সহর, কত পল্লী—তার আর ইয়ত্তা নেই। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি বহু বিষয়ের অসংখ্য বই ফিরতো পীযূষকান্তির সঙ্গে সঙ্গে। অবসরমত সেগুলো সবই সঞ্জয় একে একে প'ড়ে ফেললে। যেখানে তার ঠেকলো, সেইখানেই সে পেলে পীযূষকান্তির আন্তরিক সাহায্য। ফলে তার জ্ঞানের পরিধিও উঠলো বেড়ে। কত দিককার কত বিষয় যে সে এই তিন বছরের মধ্যে শিখে ফেললে, তা' আর কত বলবো!

যাত্রাপথে তাদের বহু বাধা-বিঘ্ন এসে জুটেছে,—বহু দুঃখ-বিপদও তাদের মাথার উপর দিয়ে গেছে, কিন্তু পীযূষকান্তির সহৃদয়তায়—তার স্নেহের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে সঞ্জয় কোনদিনই কোন অসুবিধা ভোগ করে নি। দুঃখ-কষ্টের যাবতীয় ধাক্কা পীযূষকান্তিই যেন বুক পেতে নিয়েছে।

মনে মনে সঞ্জয়কে শত সহস্রবার স্বীকার করতে হয়েছে,—পীযূষকান্তির অসাধারণ মহত্ত্বের কথা। তাঁর মত মহাপ্রাণের

আনুকূল্য যে সঞ্জয়ের জীবনে একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে,—একথাও সে বারংবার স্মরণ না ক'রে পারে নি।

তিন বৎসর পরে হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটলো।

একটি গ্রামকে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে গিয়ে, বাঘের সঙ্গে বাধলো পীযূষকান্তির লড়াই। দৈবাৎ বন্দুকের কল খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাঘের সঙ্গে বাধলো তাঁর একেবারে হাতাহাতি যুদ্ধ!

শেষপর্য্যন্ত বাঘ মরলো বটে, তবে পীযূষকান্তিও আহত হলেন গুরুতর ভাবে। তাঁকে যেতে হলো হাসপাতালে।

জীবনের আশঙ্কা অবশ্য তাঁর হয়নি; তবে হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা ক'রে অভিমত প্রকাশ করলেন—সারতে তাঁর লাগবে অনেক দিন।

এই বিপদের সময় সঞ্জয় অবশ্য তাঁর কাছ থেকে নড়তে চায় নি। কিন্তু অযথা তাকে আটকে রাখা উচিত নয় বিবেচনা ক'রে, পীযূষকান্তিই দিলেন তাকে অবসর এবং ভবিষ্যতের জন্য তাকে আশা ও আশ্বাস দিয়েই সস্নেহে, অকপট মনেই তাকে দিলেন বিদায়।

ব্যথাহত প্রাণে বিদায় নিয়ে সঞ্জয় আবার ফিরে এলো কলকাতায়।

* * * *

কলকাতার কলেজগুলোতে তখন ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি করার ধূম প'ড়ে গেছে।

'সেসন' আরম্ভ হবে শীগ্‌গির। সহসা সঞ্জয়ের মাথায় এক মতলব এসে গেলো। আর মতলবও এলো যেমন, কাজও হয়ে গেলো তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই।

কোনরূপ দ্বিধা-চিন্তা না ক'রে সে বিদ্যাসাগর কলেজে আর্টের ষ্টুডেন্টরূপে এড্‌মিশান নিয়ে ফেললে।

পীযূষকান্তির কাছ থেকে সঞ্জয় প্রায় দেড় হাজার টাকা এই তিন বছরের মধ্যে পেয়েছিলো। তার একটি পয়সাও সে কোন দিকে খরচ করে নি; আর পীযূষকান্তির মহত্ত্বে এবং সৌজন্যে তা করতেও হয় নি।

বেতন-হিসাবে সে পেয়েছিলো মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে বারো শত টাকার ওপর, আর বিদায়কালে পীযূষকান্তির কাছ থেকে পারিতোষিক-স্বরূপ পেয়েছিলো আড়াই শত টাকা। সেই টাকাটার ওপর নির্ভর ক'রেই সে নেমে পড়লো— বিদ্যার্জ্জনের ক্ষেত্রে।

ভর্ত্তি হবার পর—একদিন সে গেলো তার পরম-হিতৈষী কবির সঙ্গে দেখা করতে। বেলা তখন প্রায় আটটা। কবি তাঁর পড়াশোনার ঘরে ব'সে নিমগ্ন ছিলেন কাব্য-লক্ষ্মীর উপাসনায়।

কবির কল্পনা রূপ ধ'রে ফুটে উঠছিলো সামনের কাগজে— লাইনের পর লাইনে। কবি ছিলেন তন্ময়—বিভোর!

জানালাপথে কবিকে সাধনা-মগ্ন অবস্থায় দেখে সঞ্জয় এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালো। সহসা কবির ধ্যান-ভঙ্গ ক'রে তাঁর

ভাবের সমাধি ঘটাতে সে চাইলো না। কি জানি, কবি হয় তো একটা চির-সুন্দর অমর-ছবি তাঁর কল্পনা-তুলিকায় এঁকে তুলেছেন। এ সময় তাঁর একাগ্রতা নষ্ট ক'রে দিলে, একটা প্রায়-সমাপ্ত অমূল্য বস্তু একেবারে মাটি হয়ে যাবে।...আর তাতে কবিরও আপশোষের হয় তো সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

সুতরাং সঞ্জয় ধৈর্য্য ধ'রে প্রায় আধঘণ্টা সময় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো জানালার পাশে। তার পর কবি যখন তাঁর কবিতা শেষ ক'রে কলমটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন—তখন সঞ্জয় হাসিমুখে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার ক'রে বললেন—"ভাল আছেন কবি?"

"আরে—কে?...সঞ্জয়?"—উচ্ছ্বসিত আনন্দে কবি ব'লে উঠলেন—"এসো, এসো, এসো! আজ আমার সুপ্রভাত! ওঃ অনেক দিন তোমায় দেখি নি। তারপর আছ কেমন? কবে কলকাতা এলে? অন্যান্য সংবাদ কি?...বসো, বসো, দাঁড়িয়ে কেন?"

সঞ্জয় বসলো না। দাঁড়িয়ে থেকেই আরম্ভ করলে—তার বিগত তিন বছরের ইতিহাস। ইতিহাস শেষ ক'রে, সে জানালো, বর্ত্তমানে সে আবার কোন্ পথে তার যাত্রা সুরু করেছে।

সমস্ত শুনে আনন্দে সঞ্জয়ের পিঠ চাপড়ে কবি বললেন—"চমৎকার! তোমায় ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। হ্যাঁ, এমনি

উদ্যমী না হ'লে কি আর চলে,—না জগতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারা যায়?...আচ্ছা থাম, তোমার জলযোগের বন্দোবস্ত করি আগে,—পরে অন্য কথা হবে।"

"না, না"—সঞ্জয় কবিকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো—"তার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছি। জলযোগ করবার অনেক দিন আছে। এখন শুনুন আমার যা আবেদন। যুক্তি দিন, কি করলে ভাল হয়। যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আমি ক্রমশঃ অগ্রসর হ'তে পারছি,—তার প্রতিষ্ঠাতা আপনিই। এখনও আমার জন্যে আপনাকে করতে হবে অনেক কিছুই। জ্বালাতন হতে হবে নানারকমে।"

"জ্বালাতন!"—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে কবি বললেন—"কিসের জ্বালাতন? কি আর এমন করেছি আমি তোমার? দরিদ্র কাব্যসেবী আমি, আমার আর ক্ষমতা কতটুকু? মালিক ভগবান, আমি নিমিত্ত মাত্র। পরম মঙ্গলময় ভগবানের করুণাই তোমাকে বড় ক'রে তুলবে। যাক, এখন কিসের যুক্তি চাও, বল।"

সঞ্জয় উত্তর দিলে—"আপনি প্রকৃতই কবি। তাই এত মহৎ। কবির প্রাণ যদি আপনভোলা উদার না হলো, তবে কবি ব'লে তাঁকে বিশেষিত করতে আমার কেমন যেন ঠেকে। যা'হোক আমার ব্যাপারটি এখন শুনুন।"

কবি সতৃষ্ণনয়নে তাকালেন সঞ্জয়ের মুখের পানে।

সঞ্জয় আবার বললে—"পীযূষকান্তিবাবুর কাছ থেকে তিন বছরে পেয়েছি দেড় হাজার টাকা; কিন্তু এই দেড় হাজারের ওপর দিয়ে সব-কিছু খরচ তো আর চলবে না। তাই মাস মাস যাতে কিছু ক'রে রোজগার হয়, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কি করলে ঠিক আমার পাঠ্যজীবনের সঙ্গে খাপ খায়, আর কিছু ক'রে রোজগারও হ'তে পারে, তা আপনি বলুন"

মাথা নামিয়ে একটু ভেবে কবি বললেন—"টিউশনি কর। অন্য কিছু করা চলে না এর সঙ্গে। টিউশনিই মিশ খাবে ঠিক।...আর এক জায়গায় দু' ঘণ্টা কিম্বা দু' জায়গায় এক ঘণ্টা ক'রে দু' ঘণ্টা টিউশনি করলেই মাসে তিরিশটা টাকা নিশ্চয়ই আসবে। তুমিও স্বচ্ছন্দে বি. এ. পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে।"

সঞ্জয় বললে—"তা আমার তো পরিচয় খুব কম লোকের সঙ্গে। আর কবি হেমাঙ্গভূষণকে চেনে অনেকে। বহু লোকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাই বলি এ বিষয়ে যদি আপনি আমাকে একটু সাহায্য করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।...অবশ্য আমি নিজেও চেষ্টার ত্রুটি করবো না।"

প্রশান্ত কণ্ঠে কবি বললেন—"এ আর বেশী কথা কি?—এর জন্য এত ক'রে বলতেই বা হবে কেন? আমি করবো চেষ্টা এবং জুটিয়েও দেবো যেমন ক'রে হোক। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

সঞ্জয় কৃতার্থ হয়ে বললে—"সে আমি জানি। শুভক্ষণেই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো; যা' হোক, এখন আসি, মধ্যে মধ্যে এসে দেখা করবো।"

"নিশ্চয় করবে।"—হেমাঙ্গভূষণ আত্মীয়তাসূচক কণ্ঠে বললেন—"যখন মনে হবে, তখনই আসবে। এ তোমার নিজের ঘর। না এলে বরঞ্চ দুঃখিত হবো। আর আমিও সুযোগ ঘটলেই যাবো তোমার কাছে।"

সঞ্জয় আর বেশী কিছু না ব'লে বিদায় নিলে। কবি তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আপনমনে ব'লে উঠলেন—"না, ছোকরার মধ্যে 'পার্টস্' আছে!"

কবির চেষ্টায় সঞ্জয়ের টিউশনি জুটতে দেরী হলো না।

এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে অক্লান্ত পরিশ্রমে পড়াশোনা করতে লাগলো। মেধাবী ছাত্র ব'লে অল্পদিনের মধ্যেই সঞ্জয় কলেজের অধ্যাপক মহলে খ্যাতি অর্জ্জন করলো। সহপাঠীগণ তাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতে লাগলো।

দেখতে দেখতে আরও দুটি বছর চ'লে গেলো। যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়ে আরও বিশেষ সাফল্যের সহিতই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলো আই. এ. পরীক্ষায়। তারপর সুরু করলে বি. এ. পড়তে।

অধিকতর উৎসাহে সে প'ড়ে যেতে লাগলো গভীর নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের সহিত। ফলও ফললো তেমনি। ইংলিশে

'অনার্স' নিয়ে বি. এ. পাশ ক'রে সে একেবারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো।

সংবাদপত্রের মারফত তার কৃতিত্বের কথা প্রচারিত হলো সাধারণের মধ্যে। অনেকের সাগ্রহদৃষ্টি পড়লো এবার তার ওপর। কবি তো আনন্দে লাফাতে লাফাতে স্বয়ং তার কাছে এসে—তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করলেন।

সঞ্জয় এখানেই থামলো না। বিশেষ তোড়জোড় ক'রে পরবৎসর ইংলিশে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েও সে আবার তার কৃতিত্বের পরিচয় দান করলো। সোনাডাঙ্গা স্কুলের উপেক্ষিত ক্লাশ সেভেনের ছাত্র সেই সঞ্জয় আজ ইংলিশে ফার্ষ্ট ক্লাশ এম. এ.!

এই অপার সাফল্য-গৌরবে সে যে পরম পুলকে অভিভূত হয়ে উঠবে, এ আর বিচিত্র কি?

তার মত শোচনীয় অবস্থা এবং পরিস্থিতির মধ্যে কয়জন এমন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে? ক'জনের পক্ষেই বা তা সম্ভব।

তখন বর্ম্মায় জাপ আক্রমণ সুরু হয়েছে।...ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট দেশের যুবকদিগকে আহ্বান করেছে দলে দলে সামরিক বিভাগে যোগ দিবার জন্যে। যুদ্ধের আলোচনায় ভারতের চতুর্দ্দিকেই পড়ে গেছে একটা মহা সোরগোল।

সঞ্জয় তার জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখলে,—তার চাই অর্থ—প্রচুর অর্থ!...অর্থ না হ'লে তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে না; আর তাই যদি না পারলো, তবে এতদিন ধ'রে এত কাণ্ড ক'রে—অদৃষ্টের সঙ্গে পলে পলে ঘোরতর যুদ্ধ ক'রে—এতদূর এগিয়ে আসার কি সার্থকতা হলো তার?

না—অর্থ তার চাই,—এবং তার প্রাচুর্য্যেরও আবশ্যক। সুতরাং তাকে এমন কোন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করতে হবে,—যা'তে বেশি পরিমাণে অর্থাগম হ'তে পারে।

ইচ্ছা করলে সে কোন না কোন কলেজে প্রফেসরের পদ গ্রহণ করতে পারে। দুই তিনটি কলেজ তাকে সমাদরে আহ্বানও করছে।...

'পদ' সম্মানজনক সন্দেহ নেই। উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে শিক্ষাব্রতীর কার্য্য গ্রহণে দেশের কল্যাণই সাধন করা হয়। বিদ্যাদানের তুল্য মহৎ কাজ আর কি-ই বা আছে?...কিন্তু ও পথে সে এখন কতই বা অর্থ পাবে?...এই ত সে সবে এম. এ. পাশ ক'রে বেরিয়েছে—নূতন নূতন তাকে হয়ত একশত দেড়শত টাকার বেশি কেউ দেবে না। তারপর কতদিনে যে তার বেতন বাড়বে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

কিন্তু অর্থের তার আশু প্রয়োজন। যে পথে,—যত

শীগ্‌গির-- যত বেশি অর্থাগম হ'তে পারে, কর্ম্মজীবনে তাকে প্রবেশ করতে হবে সেই পথে।

এই সব অনেক চিন্তা ক'রে সঞ্জয় সামরিক বিভাগে কোন অফিসরের কার্য্যের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন পাঠালে।...সে ভেবে দেখলে, মিলিটারী বিভাগে মাইনেও বেশি, এলাউন্সও যথেষ্ট, তার ওপর কর্ম্মচারীদের আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির যাবতীয় খরচ গভর্ণমেণ্ট বহন করে। অতএব মিলিটারীতে যোগ দিলে তার অর্থাগম হবে অন্যান্য কার্য্যের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে।

ইংলিশে সে ফার্ষ্টক্লাশ এম. এ., আবার ইংলিশে 'অনার্স' নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে সে বি. এ. পাশ করেছে। সুতরাং অবিলম্বেই তার দরখাস্ত মঞ্জুর হলো, চারশত টাকা বেতন—তদুপরি মাগ্‌গী ভাতা এবং অন্যান্য নানা সুবিধা পেয়ে সে জনৈক অফিসারের পদে নিযুক্ত হয়ে গেলো।

উপস্থিত তার কার্য্যক্ষেত্র বা অফিস হলো খিদিরপুরে। অবশ্য প্রয়োজন মত গভর্ণমেণ্ট তাকে যখন ইচ্ছা ভারতের যে কোন স্থানে পাঠাতে পারবে।

পীযূষকান্তির সঙ্গে সঞ্জয় ঘুরে এসেছে ভারতের বহুদেশ। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট তাকে যখন যেখানেই পাঠাবে, যেতে তার

আপত্তি ছিলো না একেবারেই। সে বিশেষ উৎসাহের সহিতই কার্য্যে যোগদান করলে।

ছ'মাস পরে গভর্ণমেণ্ট সঞ্জয়ের কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হ'য়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদে তাকে লক্ষ্ণৌতে বদলী করলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাইনেও বেড়ে গেলো। চার শত থেকে দাঁড়ালো ছয় শতে।

ইতিমধ্যে রেঙ্গুন ধ্বংস হ'য়ে গেছে, জাপ সৈন্য বর্ম্মা অধিকার ক'রে এগিয়ে এসেছে চট্টগ্রামের দিকে। এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে চলেছে জাপ-বিমানের আক্রমণ।

সামরিক শক্তি দৃঢ় ও প্রবল করবার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টও নানাভাবে সচেষ্ট হয়েছে। মিলিটারী বিভাগের লোকদের সুযোগ-সুবিধাও বেড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে।

দেশের অসংখ্য তরুণ পররাজ্য-লোভী দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জাপানের আক্রমণ থেকে তাদের দেশকে রক্ষা করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। হাজারে হাজারে সব মানুষ নিযুক্ত হয়ে পড়েছে সামরিক নানা বিভাগে।

যুদ্ধের ফলে দেশের বুকে যেমন নানা রকমের পরিবর্ত্তন, অশান্তি এবং অসুবিধা এসে জুটেছে, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য গভর্ণমেণ্টও তেমনি নানা বিভাগের প্রবর্ত্তন ক'রে দেশের জনসাধারণের অসুবিধা দূর করবার ব্যবস্থা করছেন। ফলে সুষ্ঠুভাবে কার্য্য-পরিচালনের জন্য লোকের

দরকার প'ড়ে গেছে খুবই বেশি।...গভর্ণমেণ্ট অকুণ্ঠিতভাবে সকল বিভাগেরই কর্ম্মচারীদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের আন্তরিকতার সহিত কাজ করবার সুযোগ দান করছে। একই সঙ্গে সামরিক বিভাগকে পুষ্ট করতে, এবং বেসামরিক বিভাগকে নানা অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করতে গভর্ণমেণ্ট অর্থব্যয় ক'রে চলেছে অজস্র।

এমনি একটা সময়ের প্রভাবে সঞ্জয়ের দিনের পর দিন উন্নতি ঘটতে লাগলো। অবশ্য এই উন্নতির মূলে তারও যে কার্য্য-পরিচালনের কৃতিত্ব ছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

ছয়-সাত মাস পরে সে আবার বদলী হলো কানপুরে। সঙ্গে সঙ্গে তার পদোন্নতিও হলো আর মাইনেও বাড়ল।

সে এখন নয় শত টাকা বেতনের একজন বিশিষ্ট অফিসর।

দেখতে দেখতে আরো দু'টি বছর চ'লে গেল।

এই দু'বছর সঞ্জয় অক্লান্ত পরিশ্রমে, বিশেষ দক্ষতার সহিত তার কার্য্য পরিচালন ক'রে এসেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সে পড়লো টাইফয়েডে।

অবস্থা তার দিনের পর দিন সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগলো। রীতিমত সুচিকিৎসা, উপযুক্ত ঔষধ-পথ্য, সেবাশুশ্রূষা দেখা-শোনা ইত্যাদি কিছুরই ত্রুটি নাই। গভর্ণমেণ্ট থেকে সে-সব চলতে লাগলো যথোপযুক্ত ভাবে। কিন্তু রোগ তার ক্রমশঃই বেড়ে উঠতে লাগলো।

এক এক সময় ডাক্তাররা তার জীবনের আশঙ্কাও করতে লাগলেন।

সঞ্জয় মরতে চায় না। কে-ই বা চায়? কিন্তু সঞ্জয়ের জীবনের উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নি। মরতে একদিন হবে সকলকেই; সেও মরবে। চিরকাল বেঁচে থাকতে কেউ আসে নি এ জগতে। কিন্তু সঞ্জয়ের যে এখনও অনেক কাজ বাকী,—সে এখন মরলে তার জীবনটা তো ব্যর্থই হবে!...না, না, উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার আগে সে মরতে চায় না, চায় বেঁচে উঠতে—দেখতে চায় পৃথিবীর আলোক আবার সে সুস্থদেহে সুস্থমনে।

রোগ-শয্যায় প'ড়ে থাকতে থাকতে যখনই তার জ্ঞান হয়, তখনই সে ভগবানকে ডাকে, তাঁর চরণে প্রার্থনা জানায়—তাকে নীরোগ ক'রে তুলবার জন্য। ডাক্তারদের সে বলে,—তাঁদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তাকে বাঁচিয়ে দিতে।

তার ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবেই হোক, অথবা ভগবানের অনুগ্রহেই হোক, মরণোন্মুখ সঞ্জয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তনের দিকে এসেছে দেখা গেলো।

দীপ নিভে যেতে যেতে আবার যেন জ্বলে উঠলো। ডাক্তাররা আশান্বিত হয়ে উঠলেন।

ক্রমশঃই সঞ্জয়ের অবস্থা ভালর দিকে আসতে লাগলো। মেঘাচ্ছন্ন চাঁদ যেন ধীরে ধীরে মেঘ-মুক্ত হ'তে আরম্ভ করছে।

ডাক্তাররা মত প্রকাশ করলেন,—আর ভয় নেই।

ভয় আর ছিলোও না। সঞ্জয় ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করতে লাগলো।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে' সঞ্জয় প্রাণ খুলে অজস্র ধন্যবাদ দিলো ভগবানকে। চিকিৎসকগণের কাছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুললো না।

ওঃ, একেবারে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে সে! আবার যে সে জীবনে কোনদিন ধরণীর আলো দেখতে পাবে, সে আশা ছিলো না।—তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফল হবার আগে যদি সে মরে যেতো! হায়, কি গভীর বেদনা নিয়েই না তাকে এ সংসার ত্যাগ করতে হ'ত!

যাঁর অপার দয়ায় সে আবার সুযোগ পেলো তার উদ্দেশ্যসাধনের পথে অগ্রসর হ'তে, তার লক্ষ্যবস্তু আহরণের প্রচেষ্টায় তাকে নিয়োজিত করতে,—সেই অসীম শক্তিমান পরমেশ্বরকে সঞ্জয় বার বার প্রণাম করলো।

তা' ছাড়া, তার মনে-প্রাণে এমন একটা দৃঢ় আস্থাও জেগে উঠলো, যে, সে যখন এমনভাবে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে, তখন তাকে দিয়ে ভগবানের নিশ্চয়ই কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে। আর তাই যদি হয়, তবে তার কামনাও একদিন বাস্তবের রূপ ধারণ করবে। যেহেতু যার যা ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা, ভগবান তাকে সেইরূপই ফল দান করেন।

কিন্তু সঞ্জয় অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। টাইফয়েডে ভুগে তার মস্তকও এখন ঠিক কর্ম্মক্ষম নয়। দেহে মনে এবং মস্তিষ্কে পূর্ব্বেকার অবস্থা ফিরে পেতে তার যে এখন কত দিন লাগবে, তাই বা কে জানে ?

সুতরাং সে গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করলো—তাকে কার্য্য হ'তে এখনকার মত অবসর দেবার জন্য। কোনরূপ কার্য্যপরিচালনা করা তার স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যে এখন অসম্ভব, এবং তার যে এখন বহুদিন পূর্ণবিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন,—এই বলে চিকিৎসকেরাও তাকে সুপারিশ করলেন।

ফলে তার আবেদন সুবিবেচনার সহিতই মঞ্জুর হ'য়ে গেলো।...

গিরিডি জায়গাটার ওপর সঞ্জয়ের কেমন একটা আকর্ষণ ছিলো। পীযূষকান্তির সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াবার সময় সে এখানে ছিলো কয়েকদিন। জায়গাটা তার ভাল লেগেছিলো খুবই।

সুতরাং কানপুরের সহকর্ম্মী, অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে সে সটান উঠলো এসে একদিন গিরিডিতে।

একটা স্বাস্থ্য-নিবাসে করলো সে তার থাকবার ব্যবস্থা।

হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যা' যা' একান্ত আবশ্যক—তার কোনটাই সে অবহেলা করলো না। কেননা, স্বাস্থ্যই যে সকল

শক্তির উৎস,—আর স্বাস্থ্য ফিরে না পেলে, সে যে উদ্যম নিয়ে কোন কাজেই নামতে পারবে না। এটুকু সে খুব ভালভাবেই বুঝতো।

তার মিশুক স্বভাবের জন্যে এবং তার অমায়িক ব্যবহারে গিরিডিতে তার বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেলো অনেক।

বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে—যুদ্ধ ও দেশের নানা আলোচনায়,—সংবাদ-পত্র পাঠে এবং নিয়মিত ভ্রমণ ও খেলাধূলায় তার দিনগুলো বেশ স্বচ্ছন্দেই কেটে যেতে লাগলো।

ছ'মাস পরে হঠাৎ একদিন তার চমক ভাঙলো।...সে ভেবে দেখলে, না, এভাবে আর সময় নষ্ট করা যায় না। এবার তাকে কাজে নামতে হ'বে। যা সে করতে চায়,—তা আগে ক'রে ফেলাই ভাল। ভবিষ্যতের বুকে আবার কবে কি পরিবর্ত্তন ঘটে ব'সে থাকবে,—কি প্রতিকূলতা এসে জুটবে,—তা' কে জানে! সুতরাং আর নয়।

ইতিমধ্যে শরীরও তার সেরেছিলো ভাল ভাবেই। সুব্যবস্থার ফলে তার স্বাস্থ্যও পুনর্গঠিত হ'য়ে উঠেছিলো এই কয় মাসের মধ্যেই।

কার্য্য-সূচী সে আগেই তৈরী ক'রে রেখেছিলো। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না ক'রে—সে একদিন সকলকে বিস্মিত ক'রে হঠাৎ গিরিডি ত্যাগ করলে।......

সেই পল্লীগ্রাম!...যার সঙ্গে আজ তার চৌদ্দ-পনেরো বছর

কোন সম্পর্ক নেই, যার বুকে যার জলে যার ফলে যার মাটিতে সে তার জীবনের চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত বেড়ে উঠেছে,—কত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা—শান্তি-অশান্তির মধ্য দিয়ে যার বুকে চিরতরে মিশে আছে তার পিতৃ-পুরুষগণ, মিশে গেছে তার পিতা ও মাতার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে, বিনা চিকিৎসায়—এক ফোঁটা ঔষধ বা সামান্য পথ্যের অভাবে যেখানে মরেছে তার মাতা-পিতা অতি শোচনীয়ভাবেই—এবং জ্বেলে রেখে গেছে তার বুকে দুর্ব্বিসহ ব্যথার তীব্র দাবানল, যে জায়গার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বাল্য ও কৈশোরের অনন্ত স্মৃতি, যে জায়গার থেকে সর্ব্বহারা সে, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে নিতান্ত নিঃসহায় ও নিরাশ্রয়ভাবে বেরিয়ে পড়েছিলো—কেউ আসেনি একবিন্দু সহানুভূতি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে, সেই পল্লীগ্রাম আজ বহুদিন পরে আবার সঞ্জয়কে আকর্ষণ করেছে তার বুকে। সঞ্জয় গিরিডি ত্যাগ ক'রে ছুটে এসেছে,—কি জানি কিসের টানে সেই পল্লীগ্রামের আবেষ্টনীর মধ্যে, সেই জন্ম-পল্লীর—সেই মাতৃভূমির পরিত্যক্ত ক্রোড়ে।

গ্রামের চতুর্দ্দিকে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ালো প্রায় সারাটি দিন, দেখলো গ্রামখানির বুকে পরিবর্ত্তন ঘটেছে অনেক।

ফাঁকা মাঠে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কত ঘরবাড়ী,—কত পুকুর ডোবা বুজে হয়ে গেছে ডাঙ্গা। কত ঘর-বাড়ী ধ্বসে পড়েছে,—তাদের বুক ভেদ ক'রে উঠেছে কত রকমের

গাছপালা! যেখানটা ছিলো হয় তো আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ অতি নোংরা জায়গা,—সেখানে গড়ে উঠেছে দেব-মন্দির! আবার যেখানে ছিলো দেবতার মন্দির—সংস্কারাভাবে সেই জায়গা পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে,—দেব-বিগ্রহ হয় তো সেই স্তূপের মধ্যেই সমাধি লাভ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গার দেবতার যা কিছু মাহাত্ম্য লোপ পেয়েছে। নানা বুনো গাছ ও আগাছাপূর্ণ সেই ধ্বংসাবশেষ এখন ভূতের আবাস ব'লে গ্রামবাসীদের ভীতি উৎপাদন করছে।

পরিবর্ত্তনশীল জগৎ। গড়ছে ভাঙছে; ভাঙছে গড়ছে। এই ভাঙা-গড়ার যেন বিরাম নেই—অন্ত নেই। পুরাতন লয় পাচ্ছে,—নূতন আসছে। আজ যার বন্দনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত,—কাল তারই লাঞ্ছনায় বিশ্ববাসী অবাক—স্তম্ভিত। বিশ্বব্যাপী চলেছে নিত্য মুহুর্মুহু এই পরিবর্ত্তনের লীলা-খেলা।

গ্রামবাসীদের কেউ চিনতে পারেনি সঞ্জয়কে। কি ক'রেই বা চিনবে। চৌদ্দ বছরের সেই দারিদ্র্যপীড়িত শীর্ণ ম্লানমুখ—মাতৃ-পিতৃ-বিচ্ছেদে শোকাকুল নিঃসহায় নিরাশ্রয় সঞ্জয়ের সঙ্গে আজকের পূর্ণযুবক, উচ্চশিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত, নানা জ্ঞান-অভিজ্ঞতার প্রভায় মণ্ডিত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্ভ্রম-শালীনতায় উজ্জ্বল সঞ্জয়ের তফাৎ যে অনেক।

চৌদ্দ-পনেরো বছরের ব্যবধান উক্ত দুইরূপ সঞ্জয়ের মধ্যেও

যে অনেক ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে,—এনে দিয়েছে সম্পূর্ণ একটা অভিনব পরিবর্ত্তন, চারাগাছ ফলফুলে মণ্ডিত মহীরুহ হ'য়ে উঠেছে। কেমন ক'রে চিনবে তাকে লোকে ?

সে যত ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিলো আপন মনে,—কারো সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা না কয়ে,—ততই গ্রামবাসীরা তাকে দেখছিলো,—যেন একটা আশ্চর্য্যের ভাব চোখে নিয়ে, গভীর প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে। হঠাৎ তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতেও যেন সাহস হচ্ছিলো না কারুরই।

সঞ্জয় কিন্তু গ্রামের বয়স্কদের মধ্যে অনেককেই চিনতে পেরেছিলো, যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের মধ্যে যতটুকু পরিবর্ত্তন আসবার, তা বহু পূর্ব্বেই এসে গিয়েছিলো। আর এমন কোন পরিবর্ত্তন তাদের মধ্যে আসেনি,—যাতে সঞ্জয়ের তাদের চিনতে বিশেষ কষ্ট বা বিলম্ব হ'তে পারে। প্রৌঢ় বয়সে যাদের দেখা যায়,—দশ-পনেরো বছর পরে তাদের দেখলে তাদের চিনতে আর বেশী কষ্ট হয় না।

তবে অনেককে চিনতে পারলেও সঞ্জয় কথাবার্ত্তা কারো সঙ্গে বলেনি।

আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘুরে-ফিরে অনেকবার সে একই জায়গায় এসে দাঁড়ালেও ঠিক বুঝতে পারছিলো না,—তাদের বাস্তু ঠিক কোন্ জায়গাটায় ছিলো।

ঘোরাঘুরি করতে করতে অবশেষে সে বুঝলো,—তাদের

জায়গার ওপর কে একটা বেশ বড় ক'রে গোয়াল-ঘর তুলেছে। সেখানে বাঁধা অনেক গরু মহিষ ছাগল ভেড়া।

কে এই গোয়াল তুলেছে, সঞ্জয় ভেবে ঠিক করতে পারছিলো না।

তখন বেলা আর সামান্যই আছে, পাশের সরু রাস্তা দিয়ে ওপাড়ার দীনু গোপ কোথায় যাচ্ছিলো।

সঞ্জয় তাকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকলো। সঞ্জয়কে দেখেই দীনু গোপের মনে কেমন একটা সম্ভ্রম জেগে উঠলো,— সে তার আদেশ উপেক্ষা করতে পারলো না, ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলো।

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করলে—"তোমার বাড়ী তো এই গ্রামেই ?"

দীনু গোপ দুই হাত যোড় ক'রে মাথা নুইয়ে উত্তর দিলে— "এজ্ঞে হঁ !"

—"কোন্ পাড়ায় বাড়ী ? কি নাম তোমার ?"

দীনু বললে—"এজ্ঞে আমরা গোয়ালা। আমার নাম দীনু গোপ।"

সঞ্জয় আবার জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, এই যে গোয়াল-ঘরটা দেখা যাচ্ছে,—এটা কাদের তুমি জান ?"

দীনু উত্তর দিলে—"এজ্ঞে, ও গোয়াল-ঘরটা করেছেন গাঁয়ের জমিদারবাবু,—তা পেরায় পাঁচ-ছ' বছর হবেক। তবে উ-জায়গা—"

হঠাৎ সে যেন চকিত হয়ে একবার এদিক-সেদিক তাকালে; পরে আবার বললে—"উ জায়গা ছিলো সতীশ মুখুজ্জের। মুখুজ্জে, মুখুজ্জের ইস্ত্রি ম'রে গেলো। ওনাদের একটি ছেলেও ছিলো এই চৌদ্দ কি পনের বছরের হবেক। সে ছেলেটিও মা-বাপ ম'রে যাবার পর মনের দুখে গাঁ ছেড়ে কুথায় যে চ'লে গেলো,—কেউ তার হদিস পেলেক নাই। আমাদের গাঁয়ের লোক বলে,—সে নাকি হাটালে-বিটেলে প'ড়ে ম'রেই গেইছে।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে সে বললে—"ঐ জায়গাটার উপর বাবু—মুখুজ্জের একখানা কোঠাও ছিলো, অবিশ্যি সেটা বর্ষায় ধ্বসে পড়ে যায়।...তা'পর কেউ ওয়ারিশ নাই দেখে, জমিদারবাবু উখানে গোয়াল-ঘর বানাইছেন।"

মনে মনে একটু হেসে সঞ্জয় বললে—"তাহ'লে মুখুজ্জের ছেলেও বেঁচে নেই, কি বলো?"

"এজ্ঞে, গাঁয়ের সব ত তাই বলে।" দীনু উত্তর দিলে,—"আর বেঁচে থাকলে কি বাবু, এ্যাদ্দিনের মধ্যে একবার আসতেন নাই?—ভিটেটা বেচে দিয়ে গেলেও তো দশ টাকা পেতেন। ছোট ছেলে,—বাপ-মা মরে যেতে সংসারে তো আর কেউ ছিলো না—কেই বা তাকে দেখবেক শুনবেক আর কেই বা উয়োকে খেতে পরতে দিবেক? না খেতে পেয়ে মরেই গেইছে হয় তো!"

"তা' ছাড়া আর কি!"—মনে মনে কৌতুক অনুভব ক'রে সঞ্জয় বললে,—"কিন্তু একটা কথা আছে, জানো তো দীনু,—রাখে হরি, মারে কে? ভগবান সহায় হ'লে,—যার কেউ কোথাও নেই, সেও টিকে যায়।"

"এজ্ঞে হঁ-হঁ, তা-বৈকি—তা-বৈ কি!" তাড়াতাড়ি দুই হাত যুক্ত ক'রে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন ক'রে দীনু বললে,—"ভগবানের লীলে-খেলা,—মানুষ তার কি বুঝবেক?...আহা, তাই থাক বাবু, ছেলেটি বেঁচেই থাক। মুখুজ্জে ভারী ভাল মানুষ ছিলো। তেনার বংশ বেঁচে থাক।"

পরের জন্য সরল-প্রাণ দীনু গোপের এই মঙ্গল প্রার্থনায় সঞ্জয় অন্তরে-অন্তরে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না।...ক্ষণেক নীরব থেকে কথাটাকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে সে বললে—"তবে বেঁচে নিশ্চয়ই নেই।...থাকলে কখনো-না-কখনো এতদিনের মধ্যে একবার তো আসতো। বাপের ভিটের মায়া কেউ কি আর ছাড়তে পারে?...কি বলো দীনু?"

"এজ্ঞে, সে কথা আর বলতে?"—দীনু তৎক্ষণাৎ সায় দিলে,—"কথায় বলে, বাপুতি ভিটে!...লাখ টাকা পেলেও কেউ ছাড়তে চায় না। দুনিয়ার যেখানে যত ভাল জায়গাই থাক,—বাপের ভিটের মত মাটি আর কি আছে বাবু! আমরা ত এজ্ঞে, গয়লা, ক্ষেত-খামার-গোরু-বাছুর নিয়েই

থাকি। দেশ-বিদেশে আর কখন ঘুরবো? কিন্তুক তবু তো কত জায়গায়ই গেইছি;—যেখানে যতই সুখে থাকি বাবু—এই কুঁড়েঘরটিতে—যতক্ষণ ফিরে না আসি, ততক্ষণ মন যেন আর থিরই হয় না।"

সঞ্জয় বললে—"বড় দুঃখেই মানুষকে বাপের ভিটে ছেড়ে পালাতে হয় বুঝলে, দীনু! তোমাদের মুখুজ্জের ছেলে যে এসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পালিয়েছে, সে-ও কি বড় কম দুঃখেই গেছে মনে কর?"

কথাগুলো বলতে বলেতে সঞ্জয়ের চোখদুটো ছল্-ছল্ ক'রে উঠলো। বৃদ্ধ দীনু গোপের ঝাপসা দৃষ্টি তা ধরতে পারলো না।

দীনুও যেন মুখুজ্জের ছেলের দুঃখে আহত হয়ে জবাব দিলে—"আহা-হা, তা নয় বাবু,—বাপ-মা'কে হারায়ে নিঃসহায়, নিরাশ্রয় অবস্থায়—ছোট ছেলে—আহা-হা! ছেলেটিকে আমার আবছা-আবছা মনে পড়ে বাবু; কিন্তুক নামটি ভুলে গেইছি।"

সঞ্জয় আর সে সকল কথা না বাড়িয়ে বললে—"আচ্ছা দীনু, আমি তো বিদেশী মানুষ; সখ ক'রে নানা দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।...তা সন্ধ্যে হয়ে গেলো,—এখন আর যাই কোথায়? তোমাদের পাড়ায় রাতটা থাকবার মত আমাকে একটু জায়গা দিতে পারবে?"

দীনুর চিত্তে সঞ্জয়কে দেখা অবধি কেমন একটা শ্রদ্ধা এসে পড়েছিলো ; সঞ্জয় তার একেবারে অপরিচিত হ'লেও, তার হাব-ভাব প্রিয়দর্শন সুশ্রী চেহারা এবং কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ, দীনুর সরল অন্তঃকরণের নিকট তাকে যেন কত দীর্ঘ দিনের পরিচিত ক'রে তুলেছিলো। সে কৃতার্থ হয়েই বললে—"তা দেখুন দেখি বাবু, আপনি হচ্ছেন একজন ভদ্দর লোক, মাহাশয় ব্যক্তি, ঘরবাড়ী ছেড়ে বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।... গোয়ালা হ'লেও আমরা মানুষ, মানুষকে জায়গা দিব নাই একরাত থাকতে।...তা' বাবু, আপনকারারা বামুন তো ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ বামুন, আমাকে জায়গা দিলে তোমাদের জাত মরবে না।"—সঞ্জয় কৌতুকের হাসি হেসে বললে।

দীনু যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—"এজ্ঞে, না, না, তার জন্যে লয়। বামুন হ'লে থাকবার খুব ভাল জায়গাই আছে।"

—"কোথায় সে জায়গা ?"

দীনু উত্তর দিলে—"ঐ আমাদের পাড়াতে,—অথচ বামুন-পাড়ার পাশেই। আমাদের ষোল আনা গয়লার ভগবতী ঠাকুরের মন্দিরের নাটশালা।...দিব্যি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে জায়গা। সিমিট মাটি দিয়ে বাঁধানো মেঝে-বারান্দা। চারিদিক বেশ ফাঁকা—হাওয়া-বাতাস। আপুনি দিব্যি আরামেই ঘুমোবেন। আর বামুনপাড়ার ওনারাও

অনেকে উখানে সন্ধ্যের পর বেড়াতে আসেন—বসে বসে কত গল্পগুজব করেন। তেনাদের সাথে আপনকার আলাপও হবেক।"

"বেশ, বেশ।"—সম্মতির ঘাড় নেড়ে সঞ্জয় বললে—"সেই ভাল হবে। তা তুমি এখন যাবে কোথায়?"

"এজ্ঞে, যাবো এই মুদিখানার দোকানে।" অদূরবর্ত্তী একটা খড়ো ঘরের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত ক'রে দীনু জবাব দিলে—"জিনিস কিনতে।"...পরে কি জানি কেন একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে সে বললে—"আর কি-ই বা কিনবো বাবু, যা' দিনকাল পড়লো, তাতে আর আমাদের মত লোক বাঁচিবেক নাই। যা' লিতে যাবেন, তারি দর যেমন আগুন!...তাও কি সব জিনিস পাবার যো আছে বাবু!...কেরাসিন তেলের অভাবে তো এজ্ঞে, সত্যি সত্যিই পাতাটি জ্বেলে কাজ করতে হয়। সাবু বার্লি না খেয়ে রুগী ম'রে যাক,—এক ছটাক চিনি কই বার করুন দিকি আপুনি।...মাথা ঠুকলেও না! এজ্ঞে টাকায় একসের চাল, ই কখনো শুনেছেন? তুই টাকা সের সরষের তেল—তাও কি সরষের এজ্ঞে? যত সুরগুঁজোকে পেষাই ক'রে চালাচ্ছে।...পাঁচ-ছ' আনা সের—লিবার লোক ছিল নাই।...আর দোকানদারদের বাবু, কি দেমাক,—ঝম্-ঝম্ নগদপয়সা ফেলে দেন,—তবু গেরাহ্য নাই;—টাকা-পয়সার যেন মুরোদই নাই। তা' বাবু, ই-যুদ্ধ কবে মিট্‌বেক বলতে

পারেন ?—'রাজায় রাজায় লড়াই হয়, নলখাগড়ার পেরাণ যায়।'—ই যে তাই হলো বাবু।"

যুদ্ধের ফলে দেশের সর্ব্বত্র যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে,—তার ধাক্কা যে গোপ-নন্দনকে ভারী বিচলিত ক'রে তুলেছে, তারই আবেগে যে তার মুখ আর বন্ধ হ'তে চাইছে না, এটা সঞ্জয় বেশ ভালভাবেই বুঝলে।

একটু হেসে সে বললে—"টাকার বাজারও তো তেমনি উছলে উঠেছে হে।—এত টাকার সচ্ছলতা কি দেখছো কখনো ? আর তোমরাও তো টাকায় বার সেরের জায়গায় দেড় সের দুধ বেচতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছো,—চার আনার জায়গায় দেড় টাকা মুজুরী নিচ্ছো। তোমাদের ভাবনা কি ? কষ্ট তাদেরই, যাদের বিনিময়ের কিচ্ছু নেই, সেই বেচারীরাই মরছে না খেয়ে। যাক—সে সব অনেক কথা। চলো, তোমাদের ভগবতী ঠাকুরের ওখানেই যাবো।"

বিমর্ষভাবে দীনু বললে—"এজ্ঞে, সুবিধা তো আমরা কিছু বুঝতে পারছি। টাকায় দেড় সের দুধ বিচেও এক বেলা পেট পুরে খেতে পাই না। ছ্যাশময় তো এজ্ঞে হাহাকার পড়ে গেইছে। সুবিধা যে হলো কুথায়, তা তো বুঝতেই পারছি। তবে আমরা মুখ্যু মানুষ,—আপনকাররা হলেন বিদ্বেন, উ সব কথা আপনকাররাই ভাল বুঝেন!"

দীনুর কথাগুলো সঞ্জয় মনে মনে স্বীকার না ক'রে পারলো

না। আবার একটু হেসে বললে—"হ্যাঁ, কষ্ট হয়েছে বটে অনেক লোকেরই, তার তুলনায় সুবিধা হয়েছে খুব কম লোকের। যাক যুদ্ধ মিটে গেলে,—আমাদের রাজার জয় হ'লে—আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে; আবার আগের দিন ঘুরে আসবে।"

"সে আর আমাদের আমলে নয় বাবু"—যেন একটু বিমর্ষ কণ্ঠেই দীনু উত্তর দিলে,—"বুড়ো বয়সে এত দুঃখু পোয়াতে হবেক, কে জানতো? না পাচ্ছি খেতে—না পাচ্ছি পরতে। পয়সা দিয়ে জিনিস পাওয়া যায় না বাবু,—ইয়ের চেয়ে আপশোষের আর কি আছে?"

"যাক, তুমি দোকানের কাজ সেরে নাও গে"—বর্ত্তমান প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে সঞ্জয় বললে—"আমাকে ব'লে দিয়ে যাও তোমাদের ঠাকুর-ঘর কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবো। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

দীনু অঙ্গুলি-সঙ্কেত ক'রে বললে,—"এই যে ছামনেই সরু পথটা দেখছেন বাবু, এই পথটা ধ'রে চ'লে যেয়ে—বাঁয়ে ঘুরবেন। দেখবেন ইয়া বড় একটা নিমগাছ আছে, তলাটা তার সান-বাঁধানো। নিমগাছটাকে ডাইনে ফেলে,—একটু এগোয়ে যাবেন,—দেখবেন একটা কামারশাল। সেই কামারশালটার খানিকটা আগে দেখবেন সরকারী ইঁদারা,—আর ইঁদারাটার থেকে মাত্তর হাত কতক দূরেই একটা বড় গাছ, বড় গাছটার

উদিকে আছে একটা আমগাছ আর একটা জামগাছ। ঐ গাছ তিনটের মাঝখানে ডাঙ্গাপারা খানিকটা জায়গা, তার উপর দেখবেন টিনের একটা উঁচু রকমের ঘর—ঐ হলো আমাদের ভগবতী ঠাকুরের মন্দির। উয়োর পাশেই হলো বামুনপাড়া।"

দীনুর পথের সঙ্কেত দেওয়ার ধরণ-ধারণ দেখে,—সঞ্জয় মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলো। দীনু ব'লে গেলো, —তার মাথামুণ্ডু অবশ্য সে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলো না, তবে এই গাঁয়েরই মানুষ সে, পথঘাটগুলো আজ ঠিক তার স্মৃতিপথে জাগরূক না থাকলেও গোয়ালপাড়াটি সে-ই জানে, যদিও ভগবতী-মন্দির তার গ্রাম-ত্যাগের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় নি, তবু গোয়ালপাড়ায় গিয়ে সেটা যে সে অনায়াসেই বের ক'রে নিতে পারবে একথা বলাই বাহুল্য। পথঘাট জিজ্ঞাসা করবার দরকারও তার ছিলো না কিছু। তবে এখন যখন সে বিদেশী, —তখন তাকে সে ভাণ করতে হবে বৈ কি!

দীনুর বর্ণনা শেষ হ'লে সে বললে—"বেশ বেশ, আমি বুঝতে পেরেছি। আর কিছুই বলতে হ'বে না। তুমি কাজ সেরে নিয়ে বাড়ী যাও। আমি সেখানে গিয়ে তোমাকে খোঁজ করলে যেন পাই।"

"এজ্ঞে, খোঁজ করতে হবেক নাই"—দীনু সরল হাস্যে উত্তর দিলে—"আপনি আসুন, আমিই আপনকার খোঁজে ব'সে থাকবো।"

—"আচ্ছা, চলো চলো, যাচ্ছি আমি।"

দীনু আর দাঁড়ালো না। সঞ্জয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ দীনুর সারল্যের এবং আন্তরিকতার কথা ভাবতে লাগলো।

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে একঘর তাঁতির বাস। ঐদিক দিয়ে গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে পড়ে কতকগুলো ঝাউগাছের সারি, আর তারই পাশে বুড়ো পরাণ তাঁতির তাঁতঘর।

সঞ্জয় যখন গাঁয়ে ঢুকলো, তখন দেখলো, তাঁতি বুড়ো চোখে এক চশমা বেঁধে—মানে চশমাটার ছু'দিকেই মোটা স্থতো বাঁধা—ঠক্ঠক্ ক'রে মাকু ঠেলছে।

তাঁতি বুড়োকে চিনতে সঞ্জয়ের বেশি দেরি হয়নি, তবে সঞ্জয়কে সে চিনতে পারেনি মোটেই। বুড়ো যে বেশ ভাল লোক, তা জানতো সঞ্জয়। কাজেই গাঁয়ে ঢুকেই সে আলাপ জমিয়ে ফেলেছিলো বুড়োর সঙ্গে; আর তার স্থটকেশ ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসপত্র রেখেছিলো তাঁতির তাঁতঘরে।

দীনুর সঙ্গে কথা শেষ ক'রে সঞ্জয় পরাণ তাঁতির কাছে ফিরে এলো। তাঁতির ওখানে যদি থাকবার জায়গা থাকতো তবে হয় তো সে অন্ম চেষ্টা করতো না। কিন্তু পরাণের মাত্র একখানি ঘর।

সঞ্জয় পরাণকে বললে—"বুঝলে দাছু, তোমার এখানে তো আমার থাকবার জায়গা হবে না,—আর সন্ধ্যা যখন হলো, তখন তোমাদের গাঁয়ে রাত না কাটিয়ে উপায় নেই।...তা'

আমার জিনিসপত্র প্রায় সবই তোমার জিম্মায় থাকলো,—মাত্র দু-একটি যা' দরকারে লাগে নিয়ে আমি চললাম গোয়ালপাড়ায়—ভগবতী ঠাকুরের নাটমন্দিরে। ঐখানেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেছি। কাল সকালে এসে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করবো।"

পরাণ বললে—"দেখুন বাবু, আপনি তো বিদেশী। আমার সাথে আপনার জানাশোনাও তেমন কিছুই নাই। মাত্তর আজকেরই পরিচয়। যদি বিশ্বেস হয়—জিনিসপত্তর রেখে যান আমার ঘরে।…কি করবো, তেমন জায়গা আমার যদি থাকতো—আমি আপনাকে অন্য কোথাও যেতে দিতাম নাই।…আমার এই ঘরে আপনকার মত লোককে ঠাঁই যে দিই কোথায়—"

তাড়াতাড়ি ক'রে সঞ্জয় ব'লে উঠলো—"না, না, তার জন্যে তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আর বিশ্বাস ক'রেই আমার জিনিসপত্র তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি।"

"তবে তাই করুন।" পরাণ জবাব দিলে—"ভগবতী ঠাকুরের মন্দিরটি ভাল জায়গায়ই বটেক। আপনি সেখানে আরামেই থাকবেন। কিন্তুক—আমার অপরাধ নিবেন নাই।"

"কি যে বল দাদু"—ঈষৎ হেসে সঞ্জয় বললে—"তোমার সঙ্গে দাদু সম্পর্ক পাতালুম কি অপরাধ নেবার জন্য? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কাল সকালে আবার এসে দেখা করবো।"

পরাণ একেবারে গ'লে গেলো। গদগদ কণ্ঠে বললে—"বাবু,

আপনি দ্যাবতা, যেমন আপনার চেহারা তেমনি আপনার কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার। আপনার মত মানুষ আমি এতটা বয়স হলো আমার— আর কখনও দেখি নাই।”

সঞ্জয় সেখানে আর কথা না বাড়িয়ে, প্রয়োজনমত এটা-ওটা নিয়ে ‘সরাণ’ রাস্তা ধ’রে ধীরে ধীরে—গোয়ালপাড়ায় ভগবতী মন্দিরে এসে হাজির হলো।

ভগবতীর নাটমন্দিরে তখন বিস্তর লোক জমে গেছে। দীনু পাড়ার মোড়ল। দোকান থেকে ফিরে এসেই সে পাড়াময় প্রচার ক’রে দিয়েছে, কলকাতা থেকে মস্ত এক বাবু এসেছেন।...দেশ-বিদেশ ঘুরে-ঘুরে বেড়ানোই তাঁর কাজ, না-ঘুরেছেন এমন জায়গাই নাই। পৃথিবীর যেখানে যখন যা ঘটছে—সব খবরই রাখেন তিনি। মস্ত বড়লোকের ছেলে। চেহারাও যেমন কার্ত্তিকের মত—কথাবার্ত্তাও তেমনি চমৎকার। আর কতই যে লেখাপড়া শিখেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। একেবারে দেবতা হেন ব্যক্তি। আজ এক্ষুণি আসবেন তিনি আমাদের নাটশালায়—এইখানেই থাকবেন রাত্রে...ইত্যাদি—ইত্যাদি—

শুনে তো পাড়ার নানাবয়সী গোপ-নন্দন ছুটে এসে জুটে বসেছে নাটশালার চারদিকে মাঝখানে এক সতরঞ্চ পেতে, স্বয়ং দীনু গোপ তার অদূরে ব’সে আছে—মেঝের ওপর।... একটা কলসীতে ক’রে খানিকটা জল আর একটা ঘটিও

নামানো রয়েছে নাটশালার বারান্দার ঠিক নীচে। সতরঞ্চের ওপর একখানা তালপাতার পাখাও নামানো রয়েছে।

সঞ্জয় সেখানে পৌঁছতেই গোয়ালারা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে—দু'হাত জোড় ক'রে তাকে নমস্কার জানালে। দীনু এগিয়ে এসে বললে—"আসুন, আসুন বাবু, আজ আমাদের মহাভাগ্যি!"

সঙ্গে সঙ্গে সে গর্ব্বও অনুভব করলে—এমন একজন সভ্যভব্য বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানকে অতিথিরূপে এখানে আনতে পেরেছে ব'লে।

ব্যাপার দেখে সঞ্জয় তো অবাক!...অমায়িকভাবে সে বললে—"বসো সব। দাঁড়িয়ে কেন? দীনু যে ইতিমধ্যে মস্ত এক মজলিশই ক'রে বসেছে!"

আনন্দে ও গর্ব্বে সকলের দিকে একবার চেয়ে দীনু বললে—"এজ্ঞে, আপনার কথা শুনেই সব আপনাকে দেখতে ছুটে এসেছে।"

"সৌভাগ্য আমার!"—বিনীতভাবে সঞ্জয় উত্তর দিলে—"নইলে আমার মত একজন সামান্য লোককে দেখবার জন্যে তোমাদের এত আগ্রহ হ'বে কেন?"

দীনুর সমবয়স্ক গোষ্ঠ গোপ এবার নিজের ওজন একটু বাড়াবার জন্যে বললে—"এজ্ঞে দেখুন দেখি,—জাত গয়লা হলেও আমরা কি আর মানুষ চিনি না? আপুনি মানী লোক। মানী লোকের মান্যি না করলে চলবেক কেনে? মোড়ল যখন

আপনকার কথা এসে পাড়ায় বলেছে, তখনই আমরা বুঝেছি যে, আমাদের ভাগ্যি ভাল। আমরা হ'লাম মুখ্যু গয়লার ছেলে,—দুধ বিচে, না হয় গরু চরায়ে আমাদের দিন কাটে; আপনকার মতন লোককে আমরা কি কোনদিন চোখেও দেখতে পাই? দয়া ক'রে যে এসেছেন,—পায়ের ধূলো দিয়েছেন,—এই খুব।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেকেই ঐরূপ কথাবার্ত্তায় সঞ্জয়ের প্রতি সম্মান দেখালে। সঞ্জয়ও তার বিনয়-নম্র ব্যবহারে—মিষ্ট বাক্যালাপে জয় ক'রে ফেললে তাঁদের হৃদয়।

ইতিমধ্যে দীনু কখন যে বেরিয়ে গিয়েছিলো, তা সঞ্জয় টের পায়নি। বেশ বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাঁসার গ্লাসে—গ্লাসভর্ত্তি সরবৎ হাতে ফিরে এসে সে বললে—"এজ্ঞে বাবু, ঐ কলসীতে জল আছে,—হাত-পা ধুয়ে একটু সরবৎ ইচ্ছে করুন। গুড়ের লয়—চিনিরই বটেক; ভাগ্যে চিনিটুকু খরচ ক'রে ফেলাই নাই; তাই আজ আপনকার সেবায় লেগে গেলো।"

দীনুর অভ্যর্থনায় সঞ্জয় ক্রমশঃই মুগ্ধ হ'য়ে উঠছিলো। ঈষৎ হেসে সে বললে—"এ যে ভারী আদর-আপ্যায়ন সুরু করলে মোড়ল।"

"এজ্ঞে উ-কথা বলবেন না।"—বিনম্রভাবে দীনু উত্তর দিলে—"আপনকার মত ভদ্দর লোকের 'আদর-আপ্যান'

করবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? তবে তিষ্টের সময়—এই সামান্য একটুকুন সরবৎ—”

“আচ্ছা, আচ্ছা,”—সহসা বাধা দিয়ে সঞ্জয় ব'লে উঠলো—“রাখ তুমি। আমি হাত-পা ধুয়ে নিই।” মনে মনে সে দীনুর ভদ্রতার অজস্র প্রশংসা না ক'রে পারলো না।

যা হোক হাত-পা ধুয়ে সরবৎ পান ক'রে সঞ্জয় সতরঞ্চের ওপর চেপে বসলো। বলা বাহুল্য—এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথাবার্ত্তা বলছিলো।

সতরঞ্চে ব'সে পাখাটা হাতে তুলে নিয়ে সঞ্জয় জিজ্ঞেস করলে—“তা চিনি কোথায় পাও এখানে?”

দীনু উত্তর দিলে—“এজ্ঞে, সবাই পাই না; যারা চৌকীদারী ট্যাক্স দেয়, তা'রাই কখন কখন—অল্পসল্প পায়। তা আবার ‘রেশন কার্ট’ নিয়ে আড়াই ক্রোশ রাস্তা হেঁটে—মেঝেডি গাঁয়ে যেয়ে রেশনের দোকান থেকে কিনে আনতে হয়। কেরাসিন তেলও পাওয়া যায় বটেক দু'চার ছটাক। কিন্তুক যেদিন এজ্ঞে চিনি কেরাসিন আনতে যাই,—সেদিনটি একেবারে খতম। যেমন ভিড়,—দোকানদার পান্নু বেনের আবার তেমনি গরজমাফিক কাজ। পয়সা দিয়ে জিনিস আনতে যাই,—তা মনে হয়, যেন ভিক্ষে করতে গেইছি! এমনি ব্যাপার!”

“হাঙ্গামার কথা আর বলেন কেনে বাবু”—সঙ্গে সঙ্গে আর

একজন সায় দিলে—"আমরা যেন জীয়ন্তেই আধ-মরা হয়ে গেইছি। ইয়ের চেয়ে মরণ হয় তো খালাস পাই!...হয় যুদ্ধই থামুক লয় আমাদের জানগুলাই যাক। আর এত হাঙ্গামা পোয়াতে লারছি বাবু!"

সঞ্জয় এর আর কি জবাব দেবে? বললে—"আর কিছুদিন সয়ে রয়ে থাকো গোপের পো,—সব হাঙ্গামা চুকে যাবে।... গভর্ণমেণ্টই কি আর আমাদের এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্যে কম চেষ্টা করছেন?"

"হুঁ-হুঁ, তা' করছেন বৈ কি?"—গোষ্ঠ গোপ সঞ্জয়ের সমর্থন করলে—"অ্যাংরেজের রাজত্বিতে দুঃখ-কষ্ট তো কিছু ছিলো নাই বাবু; দিব্যি সব সুখে ছিলাম। যত হাঙ্গামা বাধালেক ঐ জাপান। দুষমণি করবেন আর লোক পেলেক নাই। লাগলো আমাদের রাজার সাথে। উয়োরা মরলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবেক। তা বাবু, আপনি তো সব জানছ,—এই যুদ্ধতে কে হারবেক—কে জিতবেক বলুন দেখি?"

"কে আবার জিতবেক?" আর একজন জোর গলায় ব'লে উঠলো—"দেখে লিস্ আমার কথা—জিতবেক আমাদের রাজাই।...তবে যদ্দিন দুষমণগুলো জব্দ না হচ্ছে, তদ্দিন আমাদিগে ভুগতেই হবেক। রাজা যুদ্ধ করবেক, না তুর আমার দিকে চাইবেক?...কি বাবু, আপনিই বলো তো আমার

কথা ঠিক কিনা?...এক সাথে কি দু'দিক হয়?" ব'লেই সে যেন বিজয়ীর গর্ব্বে সঞ্জয়ের দিকে তাকালো।

সঞ্জয় ঈষৎ হেসে বললে--"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো তুমি।"

এই রকম পাঁচ কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা উতরে গিয়ে আঁধার একটু ঘনিয়ে এলো। গোয়ালারা দু'একজন ছাড়া একে একে প্রায় সকলেই উপস্থিত বিদায় নিলে।

দীনু একটা লণ্ঠন জ্বেলে এনে সঞ্জয়ের সাম্‌নে নামিয়ে রেখে বললে—"বাবু, রেতে আপুনি কি খাবেন? যদি নিজে রান্না করতে পারেন—বলুন, সব যোগাড় ক'রে দিই।... আর তা যদি না পারেন তবে আমার ঘরে সরু ধানের চিড়ে, দুধ, কাঁচা আখের গুড় আর মর্ত্তমান কলা গোটা কতক আছে---তাই দিয়ে জলযোগ করবেন। অবিশ্যি আপনকার খাবার কষ্ট হবেক, কিন্তু উপায় তো নাই; কি করবেন। আমাদের হাতের রান্না তো খাওয়া চলবেক নাই আপনার?"

সঞ্জয় মনে মনে বললে—তোমার মত মন যাদের—জাতে সে যাই হোক, তার হাতের ছোঁয়া খাবার খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।—কিন্তু প্রকাশ্যে সে বললে—"না, না, আমার খাবার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। আমার একটু দুধ হলেই চলবে। এই পয়সা নিয়ে যাও, খানিকটা দুধ যোগাড় ক'রে আমাকে গরম ক'রে এনে দেবে।"

বলতে বলতে সে মণিব্যাগ খুলে একটা আধুলি বের ক'রে দীনুর সামনে নামিয়ে দিলে।

দীনুর যেন একটু অভিমান হলো। ক্ষণেক নীরব থেকে সে ক্ষুণ্ণ স্বরে বললে—"বাবু, গয়লা হ'লেও আমি মানুষ। আপনকার মত মহাশয় বেক্তি—তার উপর বাম্‌ভণ, বহু ভাগ্যে পায়ের ধূলো দিয়েছেন আমাদের ইখানে। আমরা থাকতে খরচ ক'রে আপনাকে খেতে হবেক—তাও মাত্তর একটি রাত? আর যখন আমার নিজের ঘরেই দুধ হয়!...না না বাবু, বুড়ো হলাম, কিন্তুক এমন ছোট দিশে কখনও হয় নাই আমার।"

সঞ্জয় সত্য সত্যই নিজেকে অপরাধী জ্ঞান ক'রে কুণ্ঠিত ও অপ্রতিভ হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে বললে—"না, না, অন্যায় আমার সত্যিই হয়েছে। যাক, কিছু মনে করো না দীনু! তুমি যা দেবে আমি তাই খাবো। ভাত রুটি চিড়ে মুড়ি দুধ দই যা দেবে—আমার কিছুতেই কোন আপত্তি নেই।"

দীনুর মনের ভাব এতক্ষণে কেটে গিয়ে সে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো। নিজেকে কৃতার্থ বোধ ক'রে হাসতে হাসতে সে বললে—"এজ্ঞে, ভাত কি আর দিতে পারি? গাঁয়ে আটা যে মিলবেক নাই বাবু, লয় কোন রকমে দু-পাঁচখানা লুচিই ভেজে দিতাম। গয়লার ঘর; ঘি একটু-আধটু কি থাকে

না? যাক, আপনি বসুন। সে যা হোক্ আমি করবো।" বলেই সে আবার তাড়াতাড়ি কোথায় চ'লে গেলো।

দেখতে দেখতে বামুনপাড়ার কয়েকজন যুবক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সঞ্জয়কে দেখেই তা'রা যেন কেমন ইতস্ততঃ করছিলো, কিন্তু সঞ্জয় যখন উঠে দাঁড়িয়ে তাদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলে—"আসুন, আসুন" তখন তা'রা একে একে উঠে এসে সঞ্জয়ের আশেপাশে ব'সে পড়লো।

একজন একটু সপ্রতিভ হয়ে সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলে—"আপনি?"

অমায়িক হাসি হেসে সঞ্জয় বললে—"আমি?—বিশেষ পরিচয় কিছু নেই। বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানোর একটু সখ আছে। আজ এসে পড়েছি আপনাদের এখানে, দীনু গোপের সঙ্গে আলাপ হলো; তার সৌজন্যে জুটলো এই আশ্রয়। আবার আপনাদের পেয়ে আমি আরো ধন্য হলাম।"

প্রিয়দর্শন সঞ্জয়ের শান্ত-সৌম্য এবং প্রতিভা-দীপ্ত মুখকান্তির দিকে চেয়ে আগন্তুক যুবকগণ তো আকৃষ্ট হয়েই ছিলো; আবার তার কথাবার্ত্তার মধ্যে যে সৌজন্য ফুটে উঠলো তাতে যুবকগণ তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়েও পারলো না।

একজন বললে—"আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরাও আজ সন্ধ্যায় আপনাকে পেলুম।"

"সৌভাগ্য আমারই বেশি।"—বিনীতভাবে সঞ্জয় জবাব দিলে—"ভবঘুরে বিদেশী লোক আমি,—পথেঘাটে যদি আপনাদের মত বন্ধুবান্ধব জোটে, তবে সে আমারই ভাগ্যের কথা।"

সমাগত যুবকগণের মধ্যে সঞ্জয়ের সহপাঠী বা সমবয়সী কেউ কেউ যে ছিলো না তা নয়।...থাকবারই কথা। তবে তা'রা কেউ চিনতে পারেনি সঞ্জয়কে। কিন্তু সঞ্জয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টির কাছে তাদের পরিচয় একেবারে গুপ্ত ছিলো না।

পরস্পরের মধ্যে এই চেনা—না-চেনার কারণ, একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায়।...সঞ্জয় বেশ ভাল ক'রেই জানে যে, সে এসেছে তার জন্মপল্লীতে, কথাবার্ত্তা কইছে তাদের গ্রামের লোকের সঙ্গেই। এক্ষেত্রে তার অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টি যদি তাদের চিনবার চেষ্টা করে,—কার কি নাম, এটা সঞ্জয়ের এতদিন পরে মনে না থাকলেও মানুষটির সাধারণ পরিচয় তার স্মরণ-পথে উদিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে গ্রামের যুবকগণের নিকট সঞ্জয়ের স্মৃতি কবে লুপ্ত হয়ে গেছে, এবং সঞ্জয় হঠাৎ যে এতদিন পরে এখানে এসে পড়তে পারে,—এমন সম্ভাবনাও কিছু ছিলো না। সে সম্ভাবনা থাকলেও বা একটা কথা ছিলো।...গ্রামের সঙ্গে সঞ্জয়ের যদি কিছুমাত্র সংযোগও থাকতো, তবু হয় তো কারো অনুমান শক্তি সেই সংযোগের পথ ধ'রে সঞ্জয়কে স্মৃতিপথে টেনে আনতে

পারতো, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তেমন কোন হেতুও ছিলো না কোনদিকে।

অধিকন্তু ভাল ভাল জায়গায় সভ্যভব্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে থেকে সঞ্জয় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে—জীবনকে গঠন করবার সুযোগ আহরণ করেছে এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে কার্য্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার মধ্যে শালীনতা বোধ নিয়ে আসতে হয়েছে; মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য্য এবং আলোকও অনেক সময় তার চেহারাকে দীপ্ত ক'রে তোলে। ফলে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সেই বালক সঞ্জয়ের মধ্যে এমন একটা আমূল পরিবর্ত্তন নিয়ে এসেছে যে, অতীতের সঞ্জয় এবং বর্ত্তমানের সঞ্জয়ের মধ্যে কোনরূপ মিলের বা সমতার চিহ্ন—যতটুকু সূক্ষ্মানুভূতি এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা দেখা সম্ভব হয়,—তা সমাগত যুবকদের কারোই ছিলো না।

একথাও খুব সত্য যে, পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়া বা সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে এই সব যুবকদের মধ্যে বয়সের অনুপাতে—প্রকৃতিদত্ত সাধারণ একটা পরিবর্ত্তন ছাড়া,—সেরূপ কোন আশ্চর্য্য বা চিত্তাকর্ষী পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় নি। যা হয়েছিলো তা ধরতে বিশেষ কষ্ট হবার কথা নয়। ফলে সঞ্জয়কে ওরা চিনতে না পারলেও—সঞ্জয়ের পক্ষে ওদের কাউকে কাউকে চিনে ফেলতে বেশি দেরী হয় নি।

যাই হোক রাত্রি প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত সঞ্জয় তার গ্রামবাসী যুবকদের সঙ্গে—বিদেশীর ভূমিকা নিয়েই অভিনয় ক'রে গেলো বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে এবং তারই মধ্যে সে সংগ্রহ ক'রে ফেললে—গ্রাম সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য।

দীনু গোপ এবং পাড়ার আরও তুই-একজন প্রায়ই বসেছিলো সেখানে। শুনছিলো সব কথাই।

রাত অনেকটা হয়েছে দেখে দীনু বললে—"এজ্ঞে বাবু, এইবার একটু জলযোগ করতে হবেক।"

সঞ্জয় উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর রাত ক'রে লাভ নেই। আচ্ছা নিয়ে এসো কি আনবে। তোমার পাল্লায় প'ড়ে তো আর রক্ষে নেই।" ব'লেই সে হাসলো একটু প্রীতির হাসি।

দীনুও একটু আনন্দের হাসি হেসে উঠে গেলো এবং একটু পরেই যা নিয়ে ফিরে এলো তা দেখে তো সঞ্জয় অবাক।

"এত খাবে কে মোড়ল?"—তুই চোখে বিস্ময় নিয়ে সঞ্জয় প্রশ্ন করলে—"অ্যাঁ—এ যে বিপুল আয়োজন!"

"ই আর এমন কি আছে বাবু!" খাবারগুলো নামিয়ে—আসন পাততে পাততে দীনু বললে—"নিন্ বসুন, সারাদিন যে কি খেয়েছেন, তা তো জানি না! আমার যা জুটলো এখন তাই খেয়ে কোন রকমে তো রাতটা কাটান।"

দীনুর নাতি এসেছিলো সঙ্গে একটি বড় ঘটিতে এবং একটা

গ্লাসে ক'রে জল নিয়ে। ঠাকুর্দ্দার নির্দ্দেশমত সে জলের পাত্র দুইটি যথাস্থানে নামিয়ে রেখে চ'লে গেলো।

সঞ্জয়ের কোন আপত্তিই আর টিকলো না। সে খেতে বসলো।

চিড়ে, দুধ, ক্ষীর, আম, কলা, আখের গুড়—প্রচুর!

সঞ্জয় পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন শেষ করলো। দীনুর মনে হলো,—সে হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

দীনুর এবং ভদ্র যুবকগণেরও আগ্রহাধিক্যে সঞ্জয় সেই ভগবতী মন্দিরেই দু'-চার দিনের মত তার আড্ডা পেতে বসলো।

এরা তাকে যে ভাবেই নিক,—সঞ্জয় কিন্তু মনে মনে স্থির করছিলো তার কার্য্যপন্থা এবং তার জন্যে সে প্রস্তুতও হচ্ছিলো ভেতরে ভেতরে।

পরাণ তাঁতির ঘর থেকে সে ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রগুলো এখানে নিয়ে এসেছে। বাইরে উঠি-উঠি ভাব দেখালেও মনে মনে সে বেশ জানে,—আড্ডা তার একটা চাই, নচেৎ সে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে, তা পূর্ণ করবার পথে অগ্রসর হবে কেমন ক'রে?

গ্রামের ভদ্র এবং শূদ্র—বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়গণের সঙ্গে ইতিমধ্যে সে আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। সকলেই তার মধুর ব্যবহারে প্রীত হয়ে তাকে নিতান্ত আপনার ব'লেই মনে করতে সুরু করেছে।

কেউ এখন তার সঙ্গে আর অপরিচিত বাইরের লোকের মত ব্যবহার করে না। সুখ-দুঃখের কথা প্রাণ খুলে সবাই তার কাছে বলে।

সঞ্জয়ও তাদের দুঃখ কোন্‌খানে, দুর্ব্বলতা কোথায়, কোন্ আঘাতের ব্যথা তাদের কতটুকু আহত করেছে ইত্যাদি সব কিছু ধীরে ধীরে স্বীয় অনুভূতির সাহায্যে জেনে ফেলেছে এবং তারই সুযোগ নিয়ে সে জয় ক'রে ফেলেছে সকলেরই হৃদয় সম্পূর্ণভাবে। তাদের ভালোও বেসেছে সে প্রীতি ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে। গ্রামের এবং গ্রামের লোকের নাড়ীনক্ষত্র সব কিছুই এখন তার নখদর্পণে। অবশ্য গ্রামের আভ্যন্তরীণ সংবাদ জেনে শুনে সে মর্ম্মে মর্ম্মে আহতই হয়েছে।

গ্রামবাসীর ভারী দুঃখ। জমিদারের পীড়নে, অত্যাচারে এবং অবিচারে বহু গ্রামবাসী জর্জ্জরিত। দেশের এই দুর্দ্দিন.— প্রজারা খেতে-পরতে পায় না, খাজনা দেবে কি? কিন্তু জমিদারের সে সব বিচার নাই। তাঁর নিজের হলেই হলো। প্রজার ঘরে হয় তো দু'-দিন ধ'রে হাঁড়ি চড়ছে না, অথচ জমিদারের বরকন্দাজ এসে—খাজনার দায়ে তার থালা-ঘটী-বাটী যা আছে—সব কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রজাপালন জমিদারের ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য দুই-ই! কিন্তু জমিদারের খামার-বাড়ীতে পাঁচ গোলা চাল বাঁধা থাকতেও ন্যায্য দাম দিয়েও কেউ এক সের পায় না, সাহায্য পাবার কথা তো দূরে! ন্যায়-অন্যায় বিচার

তো একেবারেই নেই। যার টাকা আছে, যে নজর দিতে পারে,—জমিদার তার দিকেই।

এই যুদ্ধের বাজারে গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যায় মানুষকে কিরূপ বিব্রত ও বিপন্নই না হতে হচ্ছে! সঙ্গতিসম্পন্ন সহৃদয় ব্যক্তি অনেকে বিপন্নের দুঃখ মোচন করতে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু এই নির্ম্মম জমিদারের শাসনে বিপন্নের বিপদ যেন আরও ঘনিয়ে উঠছে!

কত লোকের পাকা ধান যে জমিদারের লোক জোর ক'রে মাঠ থেকে তুলে নিয়ে যায়,—জোর ক'রে জমিদার যে কত প্রজার কত জায়গা তুচ্ছ অপরাধে খাস ক'রে নিয়ে তাকে পথে বসিয়ে দেন, তার ইয়ত্তা নেই। মোট কথা,—একে দুর্দ্দিনের ঘোর হাহাকার—তার ওপর জমিদারের নিষ্ঠুর পীড়নে কারো মনে শান্তি নেই। সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থের কথা স্বতন্ত্র, তারা জমিদারের বন্ধু, তাঁর অত্যাচারের সমর্থক এবং সহায়।

সাধারণ লোক আর করে কি? মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করতে বাধ্য হয়।

অক্ষম এবং নিরুপায় যারা—"হে ভগবান্, রক্ষা কর!" ব'লে আর্ত্তনাদ করা ছাড়া তাদের আর কোন সম্বলই নেই।

কিন্তু সেই অদেখা, অজানা, নিরাকার ভগবানের অস্তিত্বের প্রভাব তো কই কাউকেই রক্ষা করতে ছুটে আসে না। দুনিয়ায় দুর্ব্বলের ওপর প্রবলের পীড়ন চলেছে চিরদিনই,—সেই আদি

যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত; কিন্তু কই তার বিরাম তো নেই! চুপ ক'রে ব'সে আছেন ভগবান, সেই আগের দিনেও যেমন,— আজও ঠিক তেমনি নীরব—নির্ব্বিকার!...পীড়িতের বুকফাটা আর্ত্তনাদ নিষ্ফল হয়ে মিশিয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে।

সঞ্জয়কে একান্ত আপনার ভেবে গ্রামের লোক—তাদের হৃদয় একেবারে উন্মুক্ত ক'রে ধরেছে তার কাছে।...তাদের নিপীড়িত অন্তরাত্মা গ্রহণ করেছে সঞ্জয়কে দরদী ব'লেই। প্রাণের যাবতীয় দরদের কথা তাই তারা নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছে সঞ্জয়ের কাছে।

সঞ্জয়কে যদি তারা তাদের গ্রামের সেই সঞ্জয় ব'লে ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারতো, তবে হয় তো ব্যাপারটা দাঁড়াতো অন্যরূপ। অন্তরের দ্বার তা'হলে কেউই এমন ভাবে তার কাছে খুলে ধরতে পারতো না—তা-সে সঞ্জয়কে তারা যতই প্রীতির চক্ষে দেখুক।

গ্রামবাসীদের দুঃখের পরিচয় পেয়ে সঞ্জয়ও হয়েছে কাতর— চঞ্চল!...মন তার বার বার বলছে,—হাজার হোক্, এরা তারই লাঞ্ছিত পীড়িত গ্রামবাসী। এদের জন্য মুক্তি চাই,— শান্তি চাই।

সময়ে সময়ে জমিদারের অত্যাচারের বর্ণনা শুনতে শুনতে তার চোখ দু'টি ছল-ছল ক'রে ওঠে—তার অন্তর গর্জ্জে ওঠে জমিদারের বিরুদ্ধে। মানুষের প্রতি মানুষের এই নিপীড়ন সে সহ্য করতে

পারে না। তার মনে হয়, ভগবান তাকে মানুষ ক'রে—তার গ্রামের বুকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন, এই সব মূক আর্ত্ত নিপীড়িত দুর্ব্বল মানবের কল্যাণের জন্য।...যে উদ্দেশ্য নিয়েই সে এখানে আসুক—তার প্রথম কর্ত্তব্য—এদের মুক্তি-সাধন! জমিদারের যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় সে তো তার নিজের ওপর দিয়েই পেয়েছে! তবে?...

সে ভাবতে লাগলো এবং ভাবতে লাগলো খুব গভীর ভাবেই! ...জগতের বুকে মানুষ হয়ে দাঁড়াবার জন্য তাকে যা করতে হয়েছে,—তাকে তো একটা মহাযুদ্ধ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সরকারের যুদ্ধ-বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত না হয়েও—সে প্রকারান্তরে যোগ দিয়েছে যুদ্ধে। আবার সে দেখলো, তার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে অন্য এক রণাঙ্গন—যেখানকার জয়-পরাজয়ের ওপর নির্ভর করছে একটি নিপীড়িত গ্রামের আর্ত্ত জনসাধারণের সুখ-দুঃখ! সুতরাং আবার তাকে যুদ্ধ করতে হবে যথাসর্ব্বস্ব পণ ক'রে নির্ভীক বীরের মতই!...চালাতে হবে তাকে আবার যুদ্ধ!...

কাছারী ঘরে ব'সে আছেন জমিদার হরেন্দ্রনাথ—যেন দম্ভের অবতার!

আশে-পাশে তাঁর চাটুকারের দল। জমিদারকে সন্তুষ্ট করতে যারা 'জল উঁচু দিকে যায়' এবং 'সূর্য্য কখনো কখনো পশ্চিমেও উঠে' বলতে কুণ্ঠিত নয়।

আল্‌বোলায় তাম্রকূট সেবন করছেন হরেন্দ্রনাথ বিরাট এক তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। সুরভিত তামাকের ভুর-ভুর গন্ধে কাছারী ঘর হয়ে উঠেছে আমোদিত!···তামাক সেবন করতে করতে জমিদার ভাবছেন—গরীব প্রজাদের কার কখন কোন্ সুযোগে - মুণ্ডপাত করা যায়। মোসাহেবদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এটা-সেটা আলোচনাও হচ্ছে তাঁর।···কথায়-কথায় মোসাহেবরা তাঁর বুদ্ধির তারিফ ক'রে তাঁর স্তুতি গান করছে।

কাছারী ঘরের প্রাঙ্গণে ব'সে আছে দুই-তিন জন দরিদ্র প্রজা।···বেলা তখন দশটা। ঐ সব প্রজাদের ধ'রে আনা হয়েছে সকাল হতে না হতেই,—তারা খাজনা দিতে পারেনি ব'লে।

বরকন্দাজ মহাবীর সিং করছে সকাল থেকে তাদের ওপর বিস্তর পীড়ন, আর হুকুম প্রচার করা হয়েছে যে,—খাজনা না দিয়ে তারা উঠতে পারবে না!

হতভাগ্য দরিদ্র প্রজা!···নীরবে চোখের জল ফেলছে আর সহ্য করছে বিনা প্রতিবাদে—সেই যথেচ্ছাচার।···

তা'ছাড়া, আর কিই বা করতে পারে তারা?···প্রতিবাদের ভাষা কণ্ঠে যোগাবে, এমন শক্তি তাদের কোথায়?

হঠাৎ সঞ্জয় ঢুকলো কাছারী ঘরে,—গায়ে আজ তার সাহেবী পোষাক; ইচ্ছে ক'রেই সে প'রে এসেছে।

একে লম্বা-চওড়া চমৎকার চেহারা, তাতে গায়ের রঙ টক্‌টকে,—আর কায়দা-কানুনেও সে তেমনি দুরস্ত।

ঢুকেই সে দু'টি হাত যোড় ক'রে নমস্কার করলো জমিদারবাবুকে।

আচম্বিতে তার আগমনে জমিদার-সভা হয়ে উঠলো স্তম্ভিত—অবাক্। জমিদারের মুখে-চোখেও ফুটে উঠলো··· বিপুল আশ্চর্য্যের চিহ্ন—যেন একটু সন্ত্রস্ত এবং চঞ্চলও হয়ে উঠলেন তিনি।···

আজকাল এই যুদ্ধের বাজারে নানা দিকে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা নানা কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁদের মধ্যে কাউকে ভেবে নিয়ে—জমিদার প্রতি-নমস্কার ক'রে—সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বললেন—"আসুন, আসুন! আপনি··· কোত্থেকে আসছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুকুম করলেন—"অ্যায় মহাবীর সিং—জলদী সাবকোওয়াস্তে একঠো কুর্শি লে আও।"

চাটুকারগণ তখন তাকিয়েছিল সঞ্জয়ের দিকে—বেশ একটু ভয়ে ভয়ে।···কি জানি, বাবা,—কোত্থেকে কি বার্ত্তাই না নিয়ে এসেছে। তা'ছাড়া এ একটা কেউ-কেটা না হয়েও হয় তো যায় না!···যা চেহারা আর যা চালচলন,—নিশ্চয়ই কোন পদস্থ ব্যক্তি হবে!

চেয়ার আসতেই সঞ্জয় তাতে আসন গ্রহণ করলে,—তাকে বসতেই হলো চেয়ারে, যেহেতু সে সাহেবী পোষাকে এসেছে! তবে হ্যাঁ—জমিদারও বসেছিলেন বেশ উঁচু একটি তক্তপোষের

ওপর।...কাজেই চেয়ারে বসতে সঞ্জয় কুণ্ঠিতও হলো না তেমন।

হরেন্দ্রনাথ প্রশ্নপূর্ণনেত্রে তার পানে তাকালেন।

সঞ্জয় আরম্ভ করলো—"আচ্ছা দেখুন, আপনার গ্রামের স্বর্গীয় সতীশ মুখুজ্জের ভিটের ওপর দেখলুম,—একটা বেশ বড় গোয়ালঘর তোলা হয়েছে। ওটা কে তুলেছে জানেন? ...আপনি যখন গাঁয়ের জমিদার,—তখন আপনার তো জানবার কথাই।"

আজ এতদিন পরে—নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই—একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির মুখে এই প্রকার একটা প্রশ্ন উঠতে দেখে, জমিদার হরেন্দ্রনাথ যারপর নাই বিস্মিত হয়ে উঠলেন। এ প্রশ্ন যে কেউ কোনদিন তাঁর মুখের উপর এসে তুলতে পারে এ ধারণা তাঁর মোটেই ছিলো না। অথচ এই সাহেবী পোষাক পরা ভদ্রলোক—সরাসরি তাঁর কাছারীতে ঢুকে আর কোন কথা না কয়ে—ঐ প্রশ্নই উত্থাপন করছেন;—এর মধ্যে গুরুত্ব যে যথেষ্ট আছে, জমিদারবাবু মনে মনে তা স্বীকার না ক'রেও পারলেন না।

তবে তিনিও জমিদার হরেন্দ্রনাথ।...অনেক হয়কে নয়, নয়কে হয় করেছেন জীবনে; সহজে ঘাবড়ে যাবার বা বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা না ক'রে কিছু উত্তর দেবার পাত্র তিনি মোটেই নন্!

সঞ্জয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বেশ ধীরভাবে বললেন—দেখুন, আপনি আমার সম্পূর্ণই অপরিচিত। যে প্রশ্ন আপনি আজ আমার কাছে তুলেছেন,—তা তুলবার অধিকার আপনার আছে কি না, বা থাকলেও কতটুকু আছে বা কি সূত্রে আছে, তা যদি আপনার কাছ থেকে আমি আগে জানতে চাই,—বোধ হয় তা অন্যায় বা অস্বাভাবিক হয় না মোটেই।"

চাটুকারগণ ব'লে উঠলো—"ঠিক, ঠিক কথা। মোটেই হয় না।"

"না তা হয় না।"—চাটুকারদের কথায় কর্ণপাত না ক'রে সঞ্জয় জবাব দিলে—"তবে এটাও আপনার বোঝা আবশ্যক যে, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে আর এত সব বিষয় থাকতে আজ আমিই বা কেন—কেবল ঐ জায়গা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে আসবো? এবিষয়ে গরজ আর কারো হলো না,—আমারই বা হলো কেন?...এ প্রশ্ন তোলার অধিকার জগতে যদি কারু থাকে, তবে সে আমারই। আমি অনধিকার চর্চ্চা করতে আসিনি আপনার ন্যায় একজন অপরিণামদর্শী জমিদারের কাছে।"

অপরিণামদর্শী!—মুহূর্ত্তে হরেন্দ্রনাথের চোখ দু'টি জ্বলে' উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সংযত ক'রে ভাবলেন,—দাবীর মধ্যে যার এতখানি দৃঢ়তা, সে তো একজন তৃতীয় ব্যক্তি না হতেও পারে! কিন্তু কে এ, কে—এ?

জমিদার মনে মনে অনেক কিছু স্মরণ করতে করতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বার বার চাইতে লাগলেন সঞ্জয়ের মুখের দিকে।

"আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখছেন জমিদারবাবু," —নরম স্বরে সঞ্জয় বললে—"আমি আপনার প্রজা সতীশ মুখুজ্জের ছেলে সঞ্জয়;—মা-বাপকে হারিয়ে নিতান্ত নিঃসহায় নিঃসম্বলভাবে ভিটে-মাটি সব ফেলে সেই কিশোর বয়সে যে চ'লে গিয়েছিল জীবন-যুদ্ধের পথে!"

"অ্যাঁ অ্যাঁ"—জমিদারের চোখে মুখে যেন জগতের যাবতীয় বিস্ময় এসে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো—"তুমিই সতীশের ছেলে!—"

মনে মনে তিনি ভাবলেন,—অ্যাঁ, সেই হ্যাংলা ছেলেটার আজ এই বিস্ময়কর পরিণতি! যার অস্তিত্ব জগতে আছে ব'লে কেউ ভাবতেও পারেনি,—অন্ততঃ থাকাও সম্ভব ছিলো না, সে আজ ফিরে এসেছে,—এই বেশে—এই সমুন্নত অবস্থায়!

না না, কথাটা বিশ্বাস করতেও যেন তাঁর প্রবৃত্তি হলো না। কিন্তু প্রবৃত্তি না হোক বিশ্বাস না ক'রে তো আর উপায় নেই। ঐ সামান্য ভিটের মায়ায় কে আবার এসে পড়বে সতীশ মুখুজ্জের ছেলে সেজে?···তবে?

হরেন্দ্রনাথের মুখে সহসা কোন কথা ফুটলো না। চাটুকারগণেরও তখন যেন তাক লেগে গেছে! জোড়া জোড়া চোখ বিস্ফারিত ক'রে তারা চেয়ে আছে সঞ্জয়ের দিকে, যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে!

ঈষৎ হেসে সঞ্জয় বললে—“কি ভাবছেন জমিদার বাবু ?”

“ভাবছি”—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জমিদার বললেন—“জগতে কিছুই অসম্ভব নয়।···তোমার এই পরিণতিও একটা অসম্ভব বস্তু!···কার সাধ্যি বলবে যে তুমি সতীশের ছেলে! একেবারে বদলে গেছ···”

মাথা নত ক'রে সঞ্জয় বললো· “ভগবান মালিক। আর পাঁচজনের শুভেচ্ছা।”

“তা' কি নামটি বললে তোমার ?” -জমিদার ভ্রূকুটি ক'রে প্রশ্ন করলেন।

“সঞ্জয়”- -ধীরকণ্ঠে সঞ্জয় উত্তর দিল।

“এখন কি করছো ?···আছো কোথায় ?”

সঞ্জয় একটু হেসে জবাব দিলে— “বর্ত্তমানে করি না কিছুই, নেই-ও কোথাও।···অতীতের কথা বিস্তর—অফুরন্ত। সুযোগ ঘটে, পরে সে সকল কথা নিবেদন করবো।”

মনে মনে জমিদার সঞ্জয়ের মুণ্ডপাত করতে লাগলেন। বাহ্যতঃ কিন্তু ভাল ভাব দেখিয়ে বললেন—“বেশ, বেশ, তোমায় দেখে আজ সুখী হলাম।···তা দেখো বাপু,—ঐ জায়গার ওপর গোয়ালঘর তুলেছি আমি। এখন তোমার কি বলবার আছে বলো।”

সঞ্জয় দৃঢ়কণ্ঠে বললে—“পরের জায়গা ও-রকমভাবে অধিকার ক'রে নেওয়া তো আপনার উচিত হয়নি জমিদার

বাবু। জায়গাটা জমারও নয় যে, খাজনার দায়ে আপনি খাস ক'রে নিতে পারেন। ওটা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর!"

"হোক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর"—জমিদার বললেন, "আমার জমিদারীর মধ্যে তো বটে।···অমনি প'ড়ে ছিলো,—আমি কাজে লাগিয়েছি, তাতে আর হয়েছে কি?···তা'ছাড়া, তোমার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকতো,—তা'হলেও বা একটা কথা ছিলো।"

সঞ্জয় বললে—"যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। এখন দয়া ক'রে—গোয়ালঘর ভেঙ্গে ফেলুন, আর আমার জায়গা আমাকে ছেড়ে দিন্।"

এইখানেই জমিদার হরেন্দ্রনাথের আত্মসম্মানে বা আত্মাভিমানে আঘাত পড়লো। গাঁয়ের জমিদার তিনি,—তাঁকে যদি তার তৈরী ঘর ভেঙ্গে ফেলে, জায়গা ছেড়ে দিতে হয়,—তা'হলে তাঁর মর্য্যাদা থাকে কোথায়?···চারদিক থেকে লোকে টিট্‌কারী দেবে,—তাঁর মাথা হেঁট হবে,—আর তাঁর ওজনও অনেক নেমে যাবে সাধারণের কাছে।···না, কিছুতেই তা হয় না।

দৃঢ়কণ্ঠে যেন একটু দম্ভের সহিতই তিনি জবাব দিলেন—"ছেলেমানুষের মত কথা বলো না সঞ্জয়।···হাজার হোক, আমি এখানকার জমিদার। আমার একটা মর্য্যাদা আছে।···তুমি যা বলছো,—তা করতে গেলে আমার মর্য্যাদা থাকে কোথায়?"

"কেন থাকবে না জমিদার বাবু!"—সঞ্জয় নির্ভীকভাবেই উত্তর দিলে—"আমার জায়গা, এতদিন ছিলাম না আমি;

আপনি ব্যবহার করছিলেন ; আবার আমি আসতেই আপনি আমাকে যদি নির্ব্বিবাদে ছেড়ে দেন,—তবে এতে তো আপনার মহত্ত্বই প্রকাশ পাবে,—মর্য্যাদা যাবে কেন ?"

"না, না, তা হ'তে পারে না।"—ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে-নাড়তে জমিদার বললেন—"তুমি জমিদার নও,—জমিদারী নীতি পরিপাক করতেও তাই তুমি পারবে না।...রাজনীতির মধ্যে যেমন এমন অনেক কিছুই থাকে—যা সাধারণের মনের সঙ্গে খাপ খায় না, জমিদারী চাল-চলনের মধ্যেও তেমনই আছে এমন অনেক জিনিষ—যা তোমাদের বোধগম্য হবার নয়। জায়গা আমি ছাড়বো না ; তবে ন্যায্য দাম নিতে পারো বা পরিবর্ত্তে অন্য জায়গাও আমি তোমায় দিতে পারি।...যা তোমার খুশী।"

"কিন্তু ও যে আমার পূর্ব্বপুরুষের ভিটে !"—সঞ্জয় অবিচলিত স্বরে জবাব দিলে—"ওর মূল্যও হয় না, পরিবর্ত্তনও নেই।... যেহেতু আমার চোখে ঐ জায়গা অমূল্য এবং অতুলনীয়।... ওই জায়গাই আমার চাই যে জমিদার বাবু !"

দুর্দ্ধর্ষ-দাম্ভিক জমিদারের চক্ষু দু'টি হিংস্র শ্বাপদের মতই জ্বলে' উঠলো। ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি ব'লে উঠলেন—"চাই তো চ'লে যাও আদালতে। যা' পারো, সেইখানে গিয়েই ক'রো।...আমি ছাড়বো না।"

সঞ্জয় তখনও ধীরকণ্ঠে বললে—"এখনও বুঝে দেখুন।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—খুব দেখেছি বুঝে।" জমিদার রুক্ষভাবেই জবাব দিলেন—"জীবনে এমন অনেক বুঝেছি, তুমি আবার কি বোঝাবে আমায়? যাও—"

সঞ্জয় তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেলো,—চোখমুখ তখন তার উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু বাইরে সে একটুকু অসংযম প্রকাশ করলো না।

সে বেরিয়ে যেতেই চাটুকারদের দলে যেন হল্লা প'ড়ে গেলো। একজন বললে—"ঠিক হয়েছে। হুজুরের সঙ্গে আসে বেয়াদপি করতে!...পেটে খেতে জুটতো না তোদের,—তা' আর গাঁয়ের কে না জানে?"

আর একজন বললে—"হুঁ, হুজুরের সঙ্গে করবেন মামলা! ক'টাকা পুঁজি আছে?...এতক্ষণে মনে পড়ছে সব, সেই সোনাডাঙ্গা স্কুলে দু' পাতা ইংরেজী প'ড়ে গিয়েছিলো—যুদ্ধের বাজারে, মিলিটারীতে ঢুকে যা' হোক হয় তো কিছু একটা কাজ বাগিয়েছে। আজকাল তো—যত ছিল 'বেরুণে' সবাই হয়েছে 'কীর্ত্তনে'।...পাঁচ টাকা আনবার মুরোদও যার নেই, সেও এই যুদ্ধের সুযোগে আনছে পঞ্চাশ টাকা! তেমনি পঞ্চাশ-ষাট টাকা মাইনের কিছু কাজ একটা করছে হয় তো। আর তারই দেমাকে এসেছে হুজুরের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে! বেহায়া আর কা'কে বলে?...বলে, একদিনের উকীলের ফি জুটবে না, হুজুরের সঙ্গে করবে মামলা!"

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তাকে সমর্থন ক'রে ব'লে উঠলো --"যা' বলেছ !...আবার হুজুরের কাছে আসা হয়েছে কোট-প্যাণ্ট প'রে।...বলি, আজকালকার দিনে তো অমন বাঁদর যে-সে সাজছে,—তার আবার মুরোদ কি ? সেদিন গেলাম—ঐ এ্যারোড্রোমের দিকে বেড়াতে...দেখলাম আমেরিকানদের কেক্, পাউরুটি, বিস্কুট এবং আর-আর নানা রকম বিলিতী জিনিসের একটা দোকান রয়েছে সেখানে।...আমাদের হরেকেষ্টর ছেলে হারু সেখানে গোরাদের জিনিস বেচছে—আর খাতায় লিখছে ; সেও পরেছে কোট-প্যাণ্ট ! ক্লাস ফোর পর্য্যন্ত তো বিদ্যে--তা পাচ্ছে ষাট টাকা মাইনে !"

হঠাৎ অন্য একজন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে আরম্ভ করলে—"ও আর তুমি কি বেশী বলছো হে চাটুয্যে ! আমিও একদিন গিছলুম সেখানে ; দেখলাম সুদ্‌নো মুচি আর মেনা বাউরী করছে খানসামার কাজ—গোরাদের খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে, এঁটো-ঝুঁটোগুলো তুলছে ; তাদের গায়েও সাহেবী-পোষাক !...বেটা মুচিরই বলো আর বাউরীরই বলো, তিন হাত টেনার বেশি জুটেনি কখনো,—তা' আজ ত্রিশ-চল্লিশ টাকা ক'রে মাইনে,—আর পরণে কোট-প্যাণ্ট !"

হঠাৎ কাশি এসে তার গলার স্বর জড়িয়ে গেলো ; খক্-খক্ ক'রে বার কতক কেশে গলাটাকে পরিষ্কার ক'রে সে আবার সুরু করলে—"তা' ছাড়া ঐ মধু ঘটকের পুনো বলে সেই

ছোট ছেলেটা এমনিতেই তো দেখতে বাঁদরের মত; ডিস্‌পেনসারীতে দেয় ঝাঁট; রক্ত-পুঁজ-থুথু—আরে…রাম—রাম—ছিঃ! বামুনের ছেলে হয়ে পরিষ্কার করে দু'হাতে ক'রে; তার গায়েও দেখগে ঐ সাহেবী-পোষাক!…আজকাল ওর আবার গুমোর কি! ও তো ঘৃণার আর অসম্মানেরই চিহ্ন! যারা মানুষ—ও রকম বাঁদর সাজতে তাদের প্রবৃত্তিই হবে না যে! তা' ভাগ্যিস্ যুদ্ধটা বেধেছিল ভায়া,—তাই পেটে কিলোলে যার 'ক'-ও বেরোয় না, সেও সেজে নিলে কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী। ভাত-মুড়িও যারা পায় নি একদিন, তারাও আজ খেয়ে নিলে গোরাদের উচ্ছিষ্ট কেক্-বিস্কুট-পাউরুটি আর নানা রকমের বিলিতী খাবার!…না, এ একটা যুদ্ধ বটে! বামুন মুচি সব একাকার ক'রে দিলে!"

জমিদার হরেন্দ্রনাথের কানে এই কথা প্রবেশ করেছিলো কি-না, তিনিই জানেন, তবে সঞ্জয় চ'লে যাবার পর থেকে তাঁকে একটু বেশি রকম গম্ভীর এবং চিন্তিত ব'লে মনে হচ্ছিলো!

হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি জোরে ডাক দিলেন—"কোথায় রে রাধু, তামাক দে!"…

সঞ্জয় জমিদারী কাছারী থেকে বেরিয়ে যাবার পর তার প্রকৃত পরিচয় যেন বাতাসের সাহায্যেই অবিলম্বে গ্রামের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

যে শুনলো, সেই হলো অবাক্ !···অ্যাঁ—ঐ সতীশ মুখুজ্জের ছেলে সঞ্জয় !

সকলের কথা বলা যায় না, তবে এই সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হলো অধিকাংশ লোকই। তারা হর্ষোচ্ছ্বাসে ব'লে উঠলো—"না, ভগবান আছেন ! আজ সতীশ মুখুজ্জে বেঁচে থাকলে, কি আনন্দই না তার হতো !"

তা ছাড়া, স্বীয় পরিচয় গোপন রেখে তার মধুর ব্যবহারে ইতিপূর্ব্বেই সঞ্জয় জয় ক'রে ফেলেছিলো গ্রামবাসীদের হৃদয় ; কাজেই তাদের মুগ্ধচিত্ত সঞ্জয়কে সতীশ মুখুজ্জের ছেলে জেনে তাকে পরমাত্মীয়ের আসনে বসিয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে না ক'রে পারলো না। নির্য্যাতিত নিরীহ গ্রামবাসিগণ সঞ্জয়কে তাদের মধ্যে পেয়ে নিজেদের বুকের মধ্যে যেন একটা নব বলের সঞ্চার হয়েছে ব'লে অনুভব করতে লাগলো।

যুবকদের মধ্যেও নানা জনে নানা কথা বলতে লাগলো। একজন বললো—"আমার ভাই, প্রথম থেকেই কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিলো। এক একবার মনে পড়ছিলো, সেই সোনাডাঙ্গা স্কুলে যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি,—তখনকার কথা ; ফুটবল খেলতে গিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে আমার খুব এক চোট ঝগড়া হয়ে গেলো। কিন্তু সাহস ক'রে আমি বলতে পারছিলুম না মনের কথা। কি জানি,—এই জগতে একজনের সঙ্গে আর একজনের চেহারার মিল থাকা তো আর অসম্ভব নয় ! নচেৎ

আমার জিভে কতবারই এসেছে,—'তুমি আমাদের সতীশ কাকার ছেলে সঞ্জয় নও?'—কিন্তু মুখ ফুটাতে পারি নি সাহস ক'রে।"

রুখে ব'লে উঠলো আর একজন--"যা, যা, বাজে কথা রাখ; এখন তো ওকথা অনেকেই বলবে।...কিন্তু সে যখন পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ব'লে নিজেকে চালিয়ে দিলে তখন আর কারু মুখে সেকথা ফোটে নি। যা, যা, ওসব মানতে চাইনে।"

কিন্তু যাকে নিয়ে এত আলোচনা সেই সঞ্জয় গেলো কোথায়?...আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই যে সে উঠে গেছে জমিদারের কাছারী থেকে তারপর তো আর তাকে দেখা যায় নি গ্রামের কোথাও।

সব শুনে দীনু গোপের আনন্দ দেখে কে?...এখন সে ভাবছে,—ভাগ্যে তো সে প্রথম যখন আলাপ হয় সঞ্জয়ের সঙ্গে, তখন তার সামনে সতীশ মুখুজ্জের ছেলের মঙ্গল কামনা করেছিলো!...উলটো কিছু বললে, আজ সে আবার কোন মুখে দাঁড়াতো সঞ্জয়ের সামনে? যাক, তার সেই মঙ্গল কামনার ফল যে এমন হাতে হাতে ফলবে—তা আর কে জানতো?

কিন্তু সঞ্জয় না ব'লে না কয়ে গ্রাম ছেড়ে কোথায় চ'লে যাওয়ায় সব চেয়ে তারই ভাবনা হলো বেশি। কোন কিছুতে

তার মন যেন আর বসতে চায় না। হরদমই ভাবে,—কোথায় গেল সে?…

তিন দিন পরের কথা। বেলা তখন দশটা। হঠাৎ ভোঁ-ভোঁ শব্দে হর্ন বাজিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকলো, একসঙ্গে তিনখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটরকার, আর তিনটি কারই গিয়ে দাঁড়ালো, সটান সঞ্জয়দের বাস্তুভিটে যেখানে ছিলো,—তারই মাথায়।

পাড়া-গাঁ—সহর থেকে প্রায় সাত আট মাইল দূরে; মোটরকার এখানে আসে খুবই কম।…আবার যখন আসে, তখন দেখা যায়, মোটরে ক'রে এসেছেন সহরের কোন বড় ডাক্তার, গাঁয়ের কারও বাড়ীতে অন্তিমশয্যায় শায়িত কোন রোগীকে দেখে যমালয়ে যাবার 'ছাড়-পত্র' দিতে।…রোগী একেবারে শেষ অবস্থায় এসে না পৌঁছলে তো আর পল্লীর লোক বড় ডাক্তার ডাকে না, আর ডাকতে পারেও না।…নেহাত যখন দেখে, আর উপায় নেই, গ্রামের ধন্বন্তরী অর্থাৎ হাতুড়ে চিকিৎসক এ্যাদ্দিন আশা দিয়ে দিয়ে এইবার বেগতিক বুঝে নিজের আসাও বন্ধ করেছেন, তখন মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে নিয়ে আসে সহরের ডাক্তার।…অবশ্য ধনীদের কথা একটু স্বতন্ত্র।

তবে এই যুদ্ধের বাজারে, অন্য দু'একটা মোটরকার যে

মাঝে মাঝে না এসে পড়ে, তা নয়।...যাই হোক্, হর্নের শব্দে গ্রামবাসী সকলে চকিত হয়ে উঠলো ; গ্রামের বহু ছেলে বুড়ো যুবক প্রৌঢ় বেরিয়ে এলো ঘরের মধ্যে থেকে রাস্তায়—ব্যাপারটা জানবার জন্যে সকলে হয়ে উঠলো যেমন উৎসুক তেমনি কৌতূহলী।

সকলে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, মোটর থেকে নেমেছেন, দুইজন বাঙ্গালী সাহেব, একজন সাহেব, তাঁদের সঙ্গে সঞ্জয়। তা ছাড়া, তিনজন আর্দ্দালী, আর দু'তিন জন পুলিশ সার্জ্জেণ্ট !

ব্যাপার দেখে সকলের চক্ষু তো স্থির ! অ্যাঁ...সঞ্জয় এ কাদের এনেছে, মতলবই বা কি ? একে পাড়া-গাঁ, তায় মোটর, সাহেব, আবার আর্দ্দালী আর সার্জ্জেণ্ট ! যেমন তেমন কিছু ব'লে তো মনে হচ্ছে না ! তার ওপর ওরা এসেছে সঞ্জয়ের সঙ্গে, আর জমিদারের সঙ্গে সঞ্জয়ের বিবাদের কথাও শুনতে বাকী নেই কারুরই।

কেউ কেউ ভাবছে, জমিদার এইবার পড়েছে কঠিন পাল্লায়।—এইবার তার কিছু চৈতন্য লাভ হবে নিশ্চয়।... কারও কারও মন বলছে—হোক্, হোক্, অতি বাড় বেড়েছে আর সহ্য হয় না।

সাহেবরা হুকুম করলেন একজন আর্দ্দালীকে—"অ্যায়, বোলাও জমিদার বাবুকো। বোলো 'ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জলদী আপকো বোলাতা'।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব !···চম্‌কে উঠলো সব্বাই ! সকলে ঘন ঘন তাকাতে লাগলো এ ওর মুখের দিকে।

সঞ্জয় সাহেবদের নিয়ে দেখালো—তার সীমানা তার চৌহদ্দী, জমিদারের করা গোয়ালঘর।

সমাগত গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তিকে ডেকে একজন বাঙ্গালী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি জানেন, ঐ যে গোয়ালঘর তোলা হয়েছে, ও-জায়গাটা প্রকৃতপক্ষে কার ?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"হুজুর, ও জায়গাটা তো সতীশ মুখুজ্জের ব'লেই জানতুম, তবে আজ ক'বছর দেখছি, জমিদার বাবু ওখানে গোয়ালঘর করেছেন।···ভেতরের ব্যাপার হুজুর, আমরা জানি না।"

আরও কয়েকজনকে ডেকে ডেকে সাহেব ঐ এক কথাই জিজ্ঞেস করলেন। কেউ ভয়ে কেউ বা নির্ভয়ে কেউ বা জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস না থাকলেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা বলার মত ভরসা না পেয়ে বললে—"হুজুর, জায়গাটা আমরা সতীশ মুখুজ্জের ব'লেই জানি। আর সতীশ মুখুজ্জের কথা তো ছেড়েই দিন, ওর ছেলেও কোনদিন ও-জায়গা হস্তান্তর করেছেন ব'লে আমরা শুনি নি! তার ছেলে বেঁচে আছে ব'লেই আমরা জানতুম না। মা-বাপের মৃত্যুর পর সেই যে গেলেন, এই ফিরেছেন।"

কথাবার্ত্তা হতে হতে হস্ত-দন্ত হয়ে জমিদারবাবু সেখানে এসে পড়লেন। কোথায় রইলো তাঁর জমিদারের অভিমান, আর কোথায়ই বা তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। আভূমি নত হয়ে সাহেবদের তিনজনকে তিনটি সেলাম ঠুকে তিনি করজোড়ে জানালেন, হুজুররা দয়া ক'রে যদি তাঁর কাছারী-বাড়ীতে যান, তবে তিনি পরম কৃতার্থ হন। যেহেতু হুজুরদের বসবার জায়গা এখানে নেই, আর হুজুররা এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন তাঁর জমিদারীতে এসে, এটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

হুজুরদের মধ্যে ছিলেন মিঃ আর. সি. সেন, আই-সি-এস্, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এস্. বি. সরকার, আই-সি-এস্, মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট, আর মিঃ পি. বি. বার্ন, পুলিশ-সুপার।

সঞ্জয় যখন লক্ষ্ণৌতে ছিলো তখন পশ্চিম-ভ্রমণ-রত মিঃ সেনের সহিত তার ঘনিষ্ঠ রকম আলাপ-পরিচয় হয়। এমন কি মিঃ সেন তিন-চার দিন সঞ্জয়ের বাংলোতে আতিথ্য গ্রহণও করেন।

জমিদারের কাছে হতমানিত হয়েই সঞ্জয় আর কোন কিছু না ভেবে একেবারে জেলা-আদালতে গিয়ে মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করে এবং সময়-সুযোগমত সব কথাই বলে।

একে সঞ্জয় উচ্চশিক্ষিত, তার মধ্যে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বও ছিল, আবার সে একজন পূর্ব্বতন মিলিটারী অফিসার, তার ওপর সে মিঃ সেনের বিশেষ পরিচিত—এমন কি বন্ধু বললেও বেশি

বলা হয় না ; কাজেই মিঃ সেন তার প্রতি জমিদারের অন্যায় আচরণের কথা শুনে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ-সুপারকে সঙ্গে ক'রে বিনা দ্বিধায় চ'লে এসেছেন 'ইন্‌কোয়ারীতে'।

মিঃ সরকার মহকুমার হাকিম, কাজেই তিনি চিনতেন জমিদারকে ; জমিদারও চিনতেন মিঃ সরকারকে।

মিঃ সরকারই জমিদারের কথার জবাব দিলেন, বললেন—"শুনুন হরেনবাবু, আপনার কাছারীতে যাবার সময় আমাদের নেই, এই পথে দাঁড়িয়েই আমরা আজ বিচার করবো। ঐ দেখুন—" মিঃ সেনের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত ক'রে তিনি বললেন—"জেলার শাসনকর্ত্তা—আমারও ওপরওলা মিঃ আর. সি. সেন, আর ঐ দেখুন—" তাঁর দৃষ্টি মিঃ বার্নের দিকে ফিরলো, "স্বয়ং পুলিশ-সুপার মিঃ বার্ন।· ·আমরা আজ সকালে এসে এইখানেই এজলাস করেছি, একটা 'কেস' মীমাংসার জন্যে। কেসটির সঙ্গে আপনিই জড়িত পূরোপূরিভাবে।"

পরে সঞ্জয়ের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি আবার বললেন—"মিঃ মুখার্জ্জির পৈত্রিক ভিটের ওপর আপনি গোয়ালঘর তুলেছেন, এ কথা ঠিক কি না ?"

"হুজুর, ঠিক কথা।" কম্পিত স্বরে জমিদার জবাব দিলেন ; বুঝলেন এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে বেফাঁস কিছু বলতে গেলে শ্রীঘর-দর্শন অনিবার্য্য।

এইবার মিঃ সেনের মুখে কথা ফুটলো ; তিনি গম্ভীরভাবে

বললেন—"কথা যদি ঠিক, তবে মিঃ মুখার্জ্জির অধিকার ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন না কেন ? আপনাদের মত যথেচ্ছাচারী জমিদারের দুর্ব্ব্যবহারে যে, পল্লীগ্রামের লোকের সুখ-শান্তি নষ্ট হতে বসলো ! এর পরিণাম কি চিন্তা করেছেন ?"

মনে মনে হরেন্দ্রনাথ তখন ভাবছিলেন—উঃ, সেই সতীশ মুখুজ্জের ছেলের আজ এত প্রভাব ; একেবারে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছে !···আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে তিনি উত্তর দিলেন—"হুজুর, আমি ওঁকে এই জায়গার বদলে অন্য জায়গা দিতে চেয়েছি, কিংবা ন্যায্য মূল্যও দিতে রাজী আছি।"

—"কারণ ? এ-জায়গা ছেড়ে দিতে আপনার আপত্তি কি ?" ভ্রূকুটি ক'রে মিঃ সেন প্রশ্ন করলেন।

"হুজুর !" জমিদার বললেন,—"এই—ঘরটা যখন তুলেই ফেলেছি,—তখন হুজুর, বুঝে দেখুন—আবার যদি আমাকে নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেলতে হয়, তা'হলে—তা'হলে হুজুর,—এই—এই—আমি এখানকার জমিদার,—আমার তো একটা মান-মর্য্যাদা—"

"ড্যাম মান-মর্য্যাদা !"—গর্জ্জে উঠলেন মিঃ সেন, "আপনার ভুয়ো মান-মর্য্যাদার চেয়ে মিঃ মুখার্জ্জীর পিতৃ-পুরুষের মাটির মায়া অনেক দামী।···উনি আজ যতই উচ্চে উঠে যান, ওই তুচ্ছ মাটিই ওঁর কাছে চিরদিন স্বর্গ !...কোন কিছুর বিনিময়ে—

এমন কি আপনার সমগ্র জমিদারীর বিনিময়েও উনি তা আপনাকে দিতে রাজী নন। দেবেনই বা কেন?"

—"আজ্ঞে—আজ্ঞে—হুজুর—"

হঠাৎ জমিদারকে ধমক দিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ব'লে উঠলেন—"আর কোন কথা শুনতে চাইনে আমি। শুনুন, আমার হুকুম—মিঃ সরকারও আমার সঙ্গে একমত—আপনি সাত দিনের মধ্যে এই গোয়ালঘর ভেঙ্গে ওঁর জায়গা ছেড়ে দিন।...আবার যদি কোন গণ্ডগোল বাধান, আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়ে যাবে।"

মিঃ বার্ন এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন। ইংরেজ হলেও অনেক দিন বাংলা মুল্লুকে এসে তিনি বাংলা বুঝতেন ভালই আর বলতেও পারতেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ক'রে। মিঃ সেনের রায় শুনেই তিনি ঈষৎ হেসে ব'লে উঠলেন—"বিচার ঠিক আছে।—হামি জানি, এ জমিদারবাবু শয়তান আছে।"

লজ্জায় অপমানে জমিদার হরেন্দ্রনাথ তখন যেন আর মাথা তুলতেও পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিলো, ধরা যদি দ্বিধা হয়, তবে তার মধ্যে তিনি তদ্দণ্ডেই মিশে যান!

মিঃ সরকার আবার প্রশ্ন করলেন—"কেমন হরেন্দ্রবাবু, হুকুম শুনলেন তো?"

"হুজুররা যা হুকুম করবেন।"—জমিদার মাথা নত ক'রে বললেন।

"অল্ রাইট্!" মিঃ সেন বললেন—"মিঃ মুখার্জ্জী, তা'হলে এবার আমাদের বিদায় দিন। এরপর আপনার ওপর কোন ভাবে যদি কোন দুর্ব্ব্যবহার কেউ করে, তৎক্ষণাৎ আমাদের সংবাদ দেবেন। আমরা সর্ব্বদাই আপনার পেছনে আছি।"

সঞ্জয় প্রীতকণ্ঠে বললে—"অশেষ ধন্যবাদ মিঃ সেন আপনাদের সকলকে। আমার জন্যে আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করলেন, তা আমি জীবনে ভুলবো না।"

"আরে না না,"—মিঃ সেন বললেন, "আপনি তার জন্যে কুণ্ঠিত হবেন না।" ব'লেই তিনি তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন সঞ্জয়ের দিকে।

তারপর একে একে তিনজনেই সঞ্জয়ের কর-মর্দ্দন ক'রে বললেন—"অল্ রাইট্ মিঃ মুখার্জ্জী, গুড্‌বাই!"

—"গুড্‌বাই!"

ভোঁ-ভোঁ ক'রে তিনখানি মোটরের হর্ন আবার বেজে উঠলো।... ...

এরপর সঞ্জয়কে নিয়ে সারা গ্রামে মহা হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো। গ্রামের সর্ব্বত্রই তার আলোচনা, সকলেরই মুখে তার কথা।

জমিদারের ভয়ে ছিলো সকলেই আড়ষ্ট, কিন্তু সঞ্জয়কে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তাদের দুর্ব্বল হৃদয় নববলে হ'য়ে উঠলো বলীয়ান। সকলেরই মনে অমনি একটা আস্থা এসে গেলো

যে, সঞ্জয় তাদের হিতৈষী, সে গাঁয়ে থাকতে জমিদার আর কারুর ওপর কোন রকম যথেচ্ছাচারিতা করতে পারবেন না। সঞ্জয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি তা'রা দেখেছে স্বচক্ষে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত যার হাতধরা, সে কি আর একটা যে-সে লোক? সে সহায় থাকতে আবার কিসের ভাবনা?

পক্ষান্তরে সঞ্জয়ও ক'রে ফেললে—গ্রামবাসী সকলকে একার্য্যে আপনার। সে অযাচিতভাবে দেখতে লাগলো, গ্রামের কার কি অভাব-অভিযোগ আছে, আর অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্য করতে লাগলো যাকে যেমনভাবে করা উচিত।

ফলে চার-পাঁচ দিন যেতে না যেতেই সঞ্জয়ের প্রভাব গ্রামের মধ্যে এমনি প্রবল হয়ে উঠলো যে, স্বয়ং জমিদার হরেন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে উঠতে হলো! যা ব্যাপার, তাতে জমিদারের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলতে তো প্রজারা মোটেই ঘাবড়াবে না, কারণ সঞ্জয় আজ তাদের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর সে মেরুদণ্ড যেমন ঋজু—আবার তেমনি অনমনীয় ও শক্ত।

দেখতে দেখতে সঞ্জয় গ'ড়ে তুললো গ্রামের মধ্যে এক সমিতি। সমিতির সভ্য করলো সে গ্রামের তরুণদের তো বটেই, উপরন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট বয়স্কদেরও। সমিতির নাম দিলে সে—"বনডাঙ্গা জন-কল্যাণ সমিতি"। স্থির হলো, এই সমিতি দেখবে গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল, গ্রামবাসীর সুখ-দুঃখ,

গ্রামের স্বাস্থ্য-শিক্ষা। কারো প্রতি কোন দিক দিয়ে কোনরূপ অন্যায় অনুষ্ঠিত হলে এই সমিতি করবে তার তীব্র প্রতিবাদ এবং উপযুক্ত প্রতিকার।

এদিকে তখন সঞ্জয়ের ভিটের ওপর এক বিরাট প্রাসাদের ভিত্তি নির্ম্মাণ সুরু হয়ে গেছে। জমিদারের গোয়ালঘর হয়েছে ধূলিসাৎ।

পাশে যতীন রায়ের আরো দশ-বারো কাঠা জায়গা পতিত ছিল;—যতীন রায়কে খুশী ক'রে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে সঞ্জয় সে জায়গাটা সুদ্ধ কিনে নিয়েছে তার পরিকল্পিত প্রাসাদের জন্যে। বিস্তর কুলীমজুর মিস্ত্রী খাটছে সেখানে। কিন্তু কেউ জানে না,—ঐ প্রাসাদ তুলবার উদ্দেশ্য কি সঞ্জয়ের!

সেদিন জন-কল্যাণ সমিতির বিশেষ এক অধিবেশনে কতকগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—গ্রামের জমিদার হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করা হউক, তিনি যেন প্রজাবর্গের সর্ব্ববিধ সুবিধা-অসুবিধার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখেন, কেননা তিনি প্রজাদের মা-বাপ।...যে সকল দরিদ্র প্রজা এই ঘোর দুর্দ্দিনে অন্নাভাবে হাহাকার করছে,—এ বৎসরকার মত তাদের খাজনা মকুব করা হউক এবং যাতে তা'রা অনাহারে না মরে তিনি তার একটা সুব্যবস্থা করুন। দেশে চাউলের একান্ত অভাব,

অথচ জমিদারবাবুর গোলাবাড়ীতে প্রচুর চাউল আছে ;—তিনি ন্যায্য দরে সেই চাউল বিক্রয় করুন এবং যাদের উপস্থিত কিনবার সামর্থ্য নেই, পরে শোধ দেবার সর্ত্তে তা'দিগকে প্রয়োজনমত চাউল ধার দেবার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তাবের একখানি অনুলিপি যথাকালে জমিদারবাবুর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই অনুলিপি প'ড়ে জমিদার-বাবু তো চটেই অস্থির! উত্তেজনায় তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো—উঃ, এই সঞ্জয় ছোঁড়াটার স্পর্দ্ধা দেখছি সীমা অতিক্রম করছে। তাঁর জমিদারীর মধ্যে এই সব উৎপাত সুরু করবার কি অধিকার আছে তার? আর করলেই বা তিনি বরদাস্ত করবেন কেন? তাঁর প্রজাদের সম্বন্ধে কি করা উচিত, কি অনুচিত—তা বুঝবেন তিনি নিজে।···সমিতি! তাঁর জমিদারী চালাবেন তিনি,—এর মধ্যে সমিতির হস্তক্ষেপের কি আছে?

ভাবতে ভাবতে তিনি এতদূর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, আর নিজেকে সংযত করতে না পেরে একেবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন সমিতির কার্য্যালয়ে।

সঞ্জয় তখন আরো কয়েকজন যুবকের সঙ্গে নানা আলোচনায় রত। জমিদারকে দেখেই সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলে—"আসুন! আসুন! আপনি এসেছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য!"

কথাগুলো জমিদারের কানে বিদ্রূপের মতই শোনালো। তিনি অসংযত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"দেখ সঞ্জয়, তোমার জায়গার জন্যে তুমি যা করেছো,—করেছো! কিন্তু আমার জমিদারীর পরিচালন বা প্রজাশাসন সম্বন্ধে কোন কথা বলবার কোন অধিকার নেই তোমার।...তুমি যে সমিতি-ফমিতি ক'রে প্রকারান্তরে আমার জমিদারীতে নানারকম উৎপাত করবে, আমার প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে, এ আমি বরদাস্ত করবো না। তোমার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও এটা সমর্থন করবেন না, জেনো। আর শেষ পর্য্যন্ত আমিও কঠোর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবো। মনে করো না জমিদার হরেন্দ্রনাথ একটা ব্যাপারে একটু বেকায়দায় প'ড়ে গিয়েছিল ব'লে সে একেবারে শক্তিহীন হয়ে প'ড়েছে।"

সঞ্জয় কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ না ক'রে নম্রভাবেই উত্তর দিলে—"আপনি অযথা রাগ করছেন কেন জমিদার-বাবু?—আমি আপনার জমিদারীতে উৎপাত স্বরু করেছি, এই বা কেমন কথা?...আপনি জমিদার, প্রজার মা-বাপ! তাদের শুধু শাসন এবং পীড়ন করবারই মালিক আপনি নন—পালন এবং রক্ষণ করাও আপনার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। সেই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের দিকে চেয়ে এই ঘোর ত্বাদ্দনে দরিদ্র প্রজাদের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখতে আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি মাত্র। দেশের যারা বুদ্ধিমান

জমিদার—তাঁরা আজ সকলেই প্রজাহিতে আত্মনিয়োগ করছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রজারাই তো আপনার জমিদারী। আমরা সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ করছি মাত্র। আশা করি, আপনি বিষয়টা ভাল ক'রে বুঝে দেখবেন।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই দেখবো।"—জমিদার তেমনি উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলেন,—"আমি বুঝে দেখবার আগে তোমাকেও বুঝিয়ে দেবো ভাল ক'রেই, থামো তুমি।"—ব'লেই তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

উপেক্ষার হাসি হেসে সঞ্জয় পেছন থেকে বললে—"আচ্ছা তাই দেবেন।"

এর পর হঠাৎ একদিন এমন কাণ্ড ঘটে বসলো—যার থেকে সঞ্জয় জমিদার হরেন্দ্রনাথকে ভারী একটা কায়দার মধ্যে পেয়ে গেলো।

ক'দিন জমিদারের এমন মতিচ্ছন্ন ঘটলো যে, তিনি নিজের প্রভুত্ব এবং শক্তি জাহির করবার জন্য সমিতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যা' তা' করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর যেন একটা নেশা চেপে গেলো।...সঞ্জয় নিয়েছে প্রজাদের দিক; আর তার সাহসে প্রজারাও হয়েছে কতকটা নির্ভয়। জমিদার প্রমাণ ক'রে দিতে চাইলেন যে, তাঁর অধিকারের মধ্যে সঞ্জয় কেউ নয়—কিছু নয়। বিশেষ যথেচ্ছাচার ক'রে সঞ্জয়কে তিনি

বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে,—অন্যত্র সঞ্জয় নিজেকে যত বড় বীরই মনে করুক, তাঁর জমিদারীতে প্রকৃতপক্ষে সে সামান্য একটা প্রজা মাত্র।

এই জেদের বশে তিনি সেদিন তাঁর দুই বরকন্দাজকে হুকুম করলেন—"যারা এখনও খাজনা দেয়নি তাদের ধ'রে বেদম প্রহার ক'রে খাজনা আদায় কর। বেটারা সব শয়তান,—ঐ সঞ্জয় ছোঁড়াটার কুচক্রান্তেই সব খাজনা দিচ্ছে না।"

'ডাল-রুটি' বজায় রাখতে হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ দু'টি ছুটলো হুকুম তামিল করতে, এবং মনিব যদি বললেন একগুণ, তা'রা আরম্ভ করলো তার তিন গুণ। ফলে কারো ভাঙলো হাত, কারো ভাঙলো পা, কারো বা হলো পিঠে বেদনা।...কিন্তু বেপরোয়া লাঠি চালানোর ফলে ক্ষুদিরাম পালের মাথাই গেলো ফেটে!

মাথার বামদিকের খানিকটা যেন দু'ফাঁক হয়ে গেলো। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝর্-ঝর্ ক'রে পড়তে লাগলো। সে কি অজস্র রক্ত!···চোখে দেখলে গা শিউরে উঠে! ক্ষুদিরাম সেই অবস্থায় আর্তনাদ করতে করতে একেবারে এসে পড়লে সঞ্জয়ের পায়ে।

ব্যাপার দেখে আগুন জ্বলে উঠলো সঞ্জয়ের মাথায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে গেলো যেন তার দেহের প্রতি শিরায়-উপশিরায়!

সে তৎক্ষণাৎ দীনু গোপকে ডাকিয়ে একটা গোরুর গাড়ী ঠিক ক'রে তার ওপর ক্ষুদিরামকে তুলে সোজা গাড়ী হাঁকাতে বললে—মহকুমার সদর শহরে। সমিতির একজন তরুণ সভ্য এবং সাক্ষী-স্বরূপ নিপীড়িত দু'-তিনজন প্রজাকে সে নিলে সঙ্গে ক'রে।

মহকুমার আদালতে পৌঁছে, সে নিজের কার্ড পাঠাতেই ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সরকার বেরিয়ে এলেন অবিলম্বে—আদালতের বারান্দায়। হাস্যমুখে তিনি সঞ্জয়কে অভ্যর্থনা করলেন—"হ্যাল্লো, মিঃ মুখার্জ্জী, আবার কি ব্যাপার ?"

ক্ষুদিরাম পালের গায়ের চাদরখানা তুলে সঞ্জয় তাঁকে দেখালো তার অবস্থা ; সঙ্গে সঙ্গে বললো গ্রামের মধ্যে সমিতি গঠন এবং প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে সব কথাই।

ক্ষুদিরামের অবস্থা দেখে মিঃ সরকারের চোখমুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। "ইস্, এযে মেরে ফেলবার যোগাড়! এক্ষুণি সর্ব্বাগ্রে একে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। পরে অন্য ব্যবস্থা।" ব'লেই তিনি তৎক্ষণাৎ স্থানীয় হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষকে এক শ্লিপ লিখে ক্ষুদিরামকে আদালতের লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে। তারপর সঞ্জয়কে এজলাস-ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বললেন—"অল্ রাইট, মিঃ মুখার্জ্জী, শয়তান জমিদারকে এবারে জীবনের মত শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর বিষদন্ত দিচ্ছি আমি ভেঙে যেন আর কখনও কারো ওপর দাঁত বসাতে না পারে।"

"আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ!" সঞ্জয় সসম্ভ্রমে উত্তর দিলে, "আপনার শাসন-সীমার মধ্যে এমন একটা শয়তান মাথা তুলে' দাঁড়িয়ে থাকে, এ কেউই চায় না।"

"ঠিক ঠিক, কোন কথা বলতে হবে না আপনাকে।" মিঃ সরকার উত্তর করলেন, "আমি চিরদিনের মত ওকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি। শয়তান নিজের হাতে খাল কেটে কুমীর এনেছে।... আপনি জন-কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ওর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালন করবেন।"

সঞ্জয় বললে—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

ব্যাপারটা যে একেবারে এতদূর গিয়ে দাঁড়াবে, তা হরেন্দ্রনাথ কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি মারপিট ক'রে খাজনা আদায় করতে বলেছিলেন, কিন্তু বরকন্দাজ-পুঙ্গবেরা যে একেবারে মাথা ফাটিয়ে বসবে, এ কি তিনি আর ভাবতেও পেরেছিলেন!

তারপর আজ যে তিনি টাকার জোরে 'হয়'কে নয়—'নয়'কে 'হয়' করতে পারবেন, তারও বিশেষ কোন আশা দেখছেন না।...যেহেতু, গ্রামবাসী তাঁর প্রজা হ'লেও আজ তাদের ওপর সঞ্জয়ের প্রভাব তাঁর চেয়েও বেশি। ঘুষ দিয়ে—ধমক দিয়ে—ভয় দেখিয়ে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে পারবেন না কাউকেই। আর যদিই বা তাঁর সমর্থক মোসাহেবগণ তাঁর পক্ষে দাঁড়ায়, তবু তার পরাজয় অনিবার্য্য,

কারণ যাদের সাক্ষ্য প্রমাণ-যোগ্য, তা'রা প্রায় সকলেই দাঁড়াবে সঞ্জয়ের পক্ষে।

ওদিকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়েই ত আগে হ'তেই তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট! শুধু তাই নয়, সঞ্জয়ের প্রভাব তাঁদের ওপরও যথেষ্ট। তা ছাড়া, মহকুমা হাকিম নাকি এমনও বলেছেন যে, তাঁর 'জামিন' মঞ্জুর তিনি কোন মতেই করবেন না। ধ'রে এনেই তাঁকে হাজতে ঢোকাতে আদেশ দেবেন। তারপর যা হয় মামলার মুখে।

মামলার মুখে জেল যে অনিবার্য্য, এ বিষয়ে আর সন্দেহের কি আছে? মহকুমা আদালতেও তাঁর নিস্তার নেই, জেলা আদালতেও তাঁর পরিত্রাণ অসম্ভব।

'হাজত-বাস' আর 'জেলের' কথা মনে হ'তেই জমিদারের যেন হৃৎকম্প হ'তে লাগলো।···হায় হায়! তার চেয়ে তাঁর আত্মহত্যা করাও যে ঢের ভাল। মর্য্যাদাভিমানী জমিদার হরেন্দ্রনাথ ক্ষোভে, লজ্জায় এবং অপমানের ভয়ে দিনের পর দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন।

গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কায় আজ চার দিন ধ'রে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন শেয়াল-কুকুরের মত! কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বে ক'দিন তা সম্ভব?···আর মানুষ হয়ে—একজন বিশিষ্ট জমিদার হয়ে সে ভাবেই বা ক'দিন কাটাতে পারেন তিনি? নেহাৎ উত্তেজনায় চঞ্চল এবং অহমিকায় মত্ত হয়েই তিনি অগ্রপশ্চাৎ

ভাবতে পারেন নি। ভেবে চিন্তে কাজ না করার জন্যে আজ তাঁর নিজের ওপরই দারুণ ধিক্কার জন্মাতে লাগলো। মনে মনে তিনি বরকন্দাজ দু'টোরও মুণ্ডপাত করতে লাগলেন। ব্যাটারা একটু হাত রেখে কাজ করলে আর এমন হয়!

বহু চিন্তার পর জমিদার বুঝে দেখলেন,—এ ক্ষেত্রে সঞ্জয়ের শরণাপন্ন না হ'লে আর উপায় নেই। কিন্তু কথাটা ভাবতেই যেন তাঁর আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো—উঃ, শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে তাও করতে হবে!

কিন্তু হাজত-বাস এবং জেল খাটার চেয়ে তো সে ঢের ভাল!...সঞ্জয়ের কাছে তাঁকে ছোট হ'তে হবে বটে, কিন্তু লোক-সমাজে তাঁর মাথা তো হেঁট হবে না। আর সঞ্জয় যদি চেষ্টা করে মামলা তুলে নিতেও পারবে।

কিন্তু সঞ্জয় যদি তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করে, তবে?... জমিদারবাবু ভাবলেন কিছুক্ষণ। তবে যে তিনি আর মাথা তুলে উঠেও আসতে পারবেন না সেখান থেকে! উপরন্তু ফল হবে উল্‌টো। সুযোগ বুঝে সঞ্জয় তৎক্ষণাৎ দেবে তাঁকে পুলিশের হাতে।

তিনি ভেবেই চললেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হ'লো,—না, হাজার হোক সঞ্জয়ের প্রবৃত্তি সে রকম হ'তেই পারে না!...সঞ্জয় আজ তাঁর পরম শত্রু; কিন্তু তিনিই তাকে শত্রু ক'রে তুলেছেন নিজ হাতে।—যদি তিনি সঞ্জয়ের

শরণাপন্ন হন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে যাবার মত প্রবৃত্তি সঞ্জয়ের হ'তে পারে না কোন মতেই, অতটুকু হৃদয়হীন সে নিশ্চয়ই নয়। ইত্যাদি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে লজ্জা সঙ্কোচ কুণ্ঠা জোর ক'রে সরিয়ে নিরুপায় জমিদার হরেন্দ্রনাথ একদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা-ঢেকে সঞ্জয়ের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে সঞ্জয় আশ্চর্য্য হলো বটে, কিন্তু কোন রকম অসম্মানের ভাব তাঁর প্রতি দেখালো না। বরঞ্চ সসম্ভ্রমে উঠে যথারীতি তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বললে—"আসুন, আসুন।"

হরেন্দ্রনাথ তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে একেবারে তার হাত দু'টি চেপে ধরলেন, এবং ত্রস্তকণ্ঠে বললেন—"সঞ্জয়, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি;··· বুঝেছি আমার অন্যায় হয়েছে। এখন তুমি রক্ষা না করলে আমার মান-মর্য্যাদা কিছুতেই রক্ষা হয় না; অপমানের আশঙ্কায় আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে।"—বলতে বলতে তাঁর চোখ দু'টি ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠলো। সঞ্জয়ের মুখে দারুণ বিস্ময়ে সহসা কোন কথা ফুটলো না।

জমিদার আবার বললেন—"আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি—জীবনে আর কোন দিন প্রজাদের ওপর অত্যাচার করবো না। অসমর্থ প্রজাদের সকলের খাজনা আমি এবছর মকুব ক'রে দিচ্ছি। তা'রা কেউ অনাহারে না মরে তার ব্যবস্থাও আমি করবো,—যেমনভাবে বলবে। সত্যিই আমার

কাজ শুধু শাসন করাই নয়,—পালন করাও বটে।...এখন থেকে তাদের কল্যাণ সাধনই হবে আমার প্রধান কার্য্য। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে। আমার কথা বর্ণে বর্ণে আমি রাখবো। কিন্তু তুমি আমাকে বাঁচাও।"

হাজার হোক—হরেন্দ্রনাথ একজন মানী লোক, সম্ভ্রান্ত জমিদার। তাঁর কাতরতায় সঞ্জয় বিচলিত না হয়ে পারলো না। নিজেই যেন কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—"একি—একি করেন?...আপনি আমার প্রণম্য,—পূজনীয়। আমার হাত কি অমন ক'রে ধরতে আছে? আপনি আমাদের পিতৃতুল্য। দুঃখ মোচনের জন্য আমরা আপনার কাছে আবেদন করবো না তো করবো কার কাছে? সময়ের ফেরে আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন। আমি কি করবো?"

পরে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কি যেন ভেবে আবার বললে—"আচ্ছা যান আপনি—আমি যেমন ক'রে পারি, মিঃ সরকারের কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মোকদ্দমা তুলে নেবার ব্যবস্থা করবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ক্ষুদিরামের অবস্থা দিনের পর দিন ভালর দিকে আসছে,—তাই রক্ষা,—নয় কোন উপায় ছিলো না।"

তাড়াতাড়ি জমিদার বলে উঠলেন—"ক্ষুদিরামকেও আমি প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করবো, সঞ্জয়! সেদিক দিয়েও আমার কর্ত্তব্যের ক্রটী করবো না।"

"আচ্ছা, এখন বাড়ী যান। আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।" —সঞ্জয় জমিদারকে আবার আশ্বাস দিলে,—"আমি কালই যাবো মিঃ সরকারের কাছে।"

"ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"—ব'লেই জমিদার যেমন গা-ঢাকা দিয়ে এসেছিলেন, তেমনি গা-ঢাকা দিয়ে ধীরে ধীরে সে-স্থান ত্যাগ করলেন।

সঞ্জয় মনে মনে হেসে বললে—"যাক্,—ভগবানকে ধন্যবাদ যে এ যুদ্ধেও আমার জয় হয়েছে।"

পূর্ণ একটি বৎসর পরের কথা।...

সঞ্জয়ের পৈতৃক ভিটার উপর আজ এক বিরাট প্রাসাদ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এতদিন যার যে ধারণাই থাক,—আজ সকলেই বুঝেছে, ওটা সঞ্জয়ের বাসভবন নয়, তার বিরাট কর্ম্ম-সাধনার ক্ষেত্র।

ঐ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়েছে 'হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। ওখানে হবে বিনা ব্যয়ে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে রোগার্ত্ত মানবের চিকিৎসা, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা।

এ তল্লাটে এমন একটি জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিলো খুবই বেশি। কাজেই ঐ প্রাসাদ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য যখন চারদিকে প্রচারিত হলো, তখন শুধু বনডাঙ্গা গ্রামের নয়, চতুষ্পার্শ্বস্থ বহু গ্রামের অসংখ্য নরনারী

আনন্দে সঞ্জয়ের জয়ধ্বনি করতে লাগলো—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো তার অশেষ মঙ্গল—তার অনন্ত পরমায়ু।

দেখতে দেখতে নানা দিক থেকে আসতে লাগলো—একটি হাসপাতালের উপযোগী যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্র-পাতি এবং ঔষধ প্রভৃতি।

হাসপাতালের কক্ষগুলোকে বিভাগ অনুযায়ী যথারীতি সাজানো হ'তে লাগলো। হাসপাতালের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য বহু উচ্চশিক্ষিত বিচক্ষণ চিকিৎসক, নার্স এবং ধাত্রী প্রভৃতিও নিযুক্ত হ'তে লাগলো—একে-একে।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দিবসে সঞ্জয় করলো এক বিরাট সভার আয়োজন।

নিমন্ত্রণ করলো সে তার পরিচিত-অপরিচিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে।...গাঁয়ের তরুণগণ—বিশেষ ক'রে দীনুর নেতৃত্বে গোয়ালাপাড়ার যুবকদের দল—সঞ্জয়ের ফাই-ফরমাস মত নানা দিকে ছুটতে লাগলো।

সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ সেন, মহকুমা হাকিম মিঃ সরকার, মিঃ বার্ন, তল্লাটের বহু বিশিষ্ট লোক এবং স্বয়ং জমিদার হরেন্দ্রনাথ। তা'ছাড়া এলেন পীযূষকান্তি এবং কবি হেমাঙ্গভূষণ।

পীযূষকান্তি এবং কবির সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান বরাবরই চলতো। জীবনে কোন দিন সঞ্জয় কি তাঁদের ভুলতে পারে?

সভার উদ্বোধন করলেন কবি হেমাঙ্গভূষণ। তারপর মিঃ সেনকে সভাপতি পদে বরণ ক'রে সভার কার্য্য আরম্ভ হলো।

সঞ্জয় সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বললে—"আজ যে আমি এমন একটি দিনের সম্মুখীন হ'তে পারবো—এ আশা আমার ছিলো না। তবে ভগবানের অনুগ্রহে এবং আপনাদের শুভেচ্ছায় আমার বহু দিনের স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে।

"মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে বাপ-মা দুইজনকেই হারিয়ে—নিরাশ্রয়—নিঃসহায়—নিঃসম্বল আমি আমার সাধের জন্মভূমি ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য হই।···আমার দরিদ্র মাতা-পিতার শোচনীয় মৃত্যু যে কি মর্ম্মান্তিক, তা বোঝাবার মত ভাষা আমার নেই। বিনা চিকিৎসায়—ঔষধ-পথ্যের অভাবে তাঁদের সেই মৃত্যুবরণের হৃদয়-ভেদী দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।—তল্লাটের বহু ডাক্তার-কবিরাজের কাছে আমি ছুটেছি,—প্রাণের আকুলতায় তাঁদের পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছি; কিন্তু কেউই বিনা পয়সায় আমার বাপ-মাকে এক ফোঁটা ঔষধ পর্য্যন্ত দিতে রাজী হন নি। চিকিৎসা করা তো দূরের কথা, উপেক্ষা ও বিদ্রূপ ক'রে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠলো,—চোখ দু'টি জলে ভ'রে এলো, নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার বলতে লাগলো—"তাঁদের মৃত্যুতে আমি বেশ বুঝেছি, দরিদ্র

যারা, অসমর্থ যারা,—অর্থাভাবে তাদের ঘরের রোগী কি মর্ম্মান্তিকভাবেই না মৃত্যু বরণ করে! সেইদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি,—যদি কোন দিন মানুষ হয়ে উঠতে পারি, আর যদি ঈশ্বর সুযোগ দেন, তবে তল্লাটের দরিদ্র যারা, তারা যেন আমার মাতা-পিতার মত মৃত্যু বরণ না করে, তার ব্যবস্থা আমি কিছু ক'রে যাবো। ভগবানের অশেষ আশীর্ব্বাদ যে, আমার সেই পরিকল্পনাই আজ বাস্তবে পরিণত হ'তে চলেছে।

"আমার অতীত কর্ম্মজীবনের কাল খুব বেশী নয়। তার মধ্যে উপার্জ্জিত প্রায় সমস্ত অর্থই আমি এর পেছনে ব্যয় করেছি এবং জীবনে আবার যা কিছু করতে পারবো, এরই উন্নতির জন্যে তা নিয়োজিত হবে।...তবু আমি বলতে বাধ্য যে আমার ক্ষমতা নিতান্ত কম। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান যাতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ ক'রে আর্ত্ত মানবের কল্যাণ সাধন করতে পারে,—এখন সে দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে।... এখন একে আমি আপনাদেরই হাতে তুলে দিলাম।

"আমার স্বর্গীয়া জননীর পবিত্র স্মৃতি-রক্ষার্থে আমি এই হাসপাতালের নামকরণ করছি—'করুণাময়ী আরোগ্য-নিকেতন'। আশা করি আপনারা আমার এ প্রস্তাব সমর্থন ক'রে আমাকে কৃতার্থ করবেন।

"পরিশেষে নিবেদন—যাঁরা আমাকে জগতে মানুষ হবার

পথে সাহায্য করেছেন,—নাম ক'রে তাঁদের ছোট করতে চাই না ; কিন্তু আজ আপনাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁদেরও অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।"

সভাস্থ সকলেই সমস্বরে সঞ্জয়ের সাধুবাদ ক'রে উঠলেন।

পীযূষকান্তি উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে নমস্কার ক'রে বললেন—"সাধারণের হিতার্থে আমি সানন্দে এই হাসপাতাল পরিচালনের সাহায্যস্বরূপ কুড়ি হাজার টাকা দান করছি। মিঃ মুখার্জ্জী এককালে আমার সহচর ছিলেন,—এজন্য আমি আজ গৌরবান্বিত। তাঁর মহত্ত্বই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।"

সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করলেন।

অতঃপর আরও দুই-একজনের এবং সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর জমিদার হরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে নমস্কার ক'রে বললেন—"আমার পরম গৌরব যে সঞ্জয় আমার প্রজা। যদিও ভুল ক'রে আমি একদিন তার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু আজ আর আমাদের মধ্যে কোন অসদ্ভাব নেই। বরঞ্চ সঞ্জয়কে সকল ব্যাপারে মিত্ররূপে লাভ ক'রে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

"সঞ্জয় যদি গ্রহণ করে, তবে আমিও এ প্রতিষ্ঠানে কিছু দান করতে বিশেষ ইচ্ছুক।...যদিও সে দানের প্রসঙ্গ এখানে

উত্থাপন করা একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে, তবু উল্লেখ করছি এইজন্যে যে, আপনাদের সকলকে—ঠিক এমনিভাবে একসঙ্গে পাবার সুযোগ বোধহয় আমার আর ঘটবে না।...আমার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। কন্যাটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী এবং সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্তা। সঞ্জয়ের হাতে আমি তাকে দান করতে চাই। সঞ্জয় তাকে গ্রহণ করলে, আমি যৌতুকস্বরূপ আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক অংশ তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য যথারীতি উইল ক'রে দান করবো।...এখন—"

তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মিঃ সেন গভীর পুলকে হাস্যমুখে ব'লে উঠলেন—"উত্তম, উত্তম প্রস্তাব! আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি।"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত এমন এক প্রস্তাবে সঞ্জয় কেমন যেন হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু মিঃ সেন চেয়ার থেকে উঠে তাকে একটা ঝাঁকনা দিয়ে বললেন—"চীয়ার আপ, মিঃ মুখার্জ্জী, কোন আপত্তি চলবে না। সহধর্ম্মিণী না হ'লে এত বড় একটা কাজে আপনার বুকে শক্তি সঞ্চার করবে কে?—শুধু মিঃ মুখার্জ্জীকে দেখে আর আমাদের তেমন আনন্দ হচ্ছে না,—এবার থেকে আমরা মিসেস্ মুখার্জ্জীকেও দেখতে চাই।"

মিঃ সরকার এবং পীযূষকান্তিও তাতে সায় দিলেন।

মিঃ বার্ন ঘাড় নেড়ে ঈষৎ হেসে বললেন—"আই সি! জমিদারবাবু চালাক আছে। আমরা 'ভোজ' খাবে।"

সকলেই তাঁর কথায় হেসে উঠলেন।

কবি হেমাঙ্গভূষণ গেয়ে উঠলেন,—

"জীবন-সঙ্গিনী চাই জীবনের পথে,
একাকী পথের ক্লান্তি হয় কি গো দূর?"

"কবি ঠিক বলেছেন।"—মিঃ সেন ব্যস্তভাবে বললেন,—"চলুন, চলুন,—আজই আমরা ভাবী মিসেস্ মুখার্জীকে দেখে শুভ-মিলনের দিন ঠিক ক'রে যাবো। চলুন, জমিদারবাবু!..."

জমিদারবাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ ক'রে সকলে চললেন জমিদার-বাড়ীর দিকে।

* * * *

তিন-চারদিন পরে গ্রামের সকলে দেখলে—জমিদার-বাড়ীতে মহা-সমারোহে বিবাহ-মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে।

—শেষ—